রুমাবাঈ

রামপদ চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল

সুধীর মৈত্র

বন্ধুবরেষু—

এই লেখকের

বনপলাশির পদাবলী

লালবাঈ

দ্বীপের নাম টিয়ারঙ

এই পৃথিবী

সমগ্র

ক্ষমাবাঈ

কর

পড়ে

প্রতাপ

লা

শ্রী

জড়িয়ে

ঘটনার স্থা

এই লেখকের

বনপলাশ

লালবাঈ

দ্বীপের নাম

এই পৃথিবী

—সমগ্র

যখনকার কথা বলছি আনারবাগ তখন নেটিভ স্টেট ইনামপুরের রাজধানী। নতুন বা পুরোনো কোনো মানচিত্রেই অবশ্য এ নাম জুটো খুঁজে পাবেন না। কারণ, নিখাদ সত্যি ঘটনাটা বলবার মতো দুঃসাহস আমার নেই এবং বলা হয়তো উচিতও নয়। ডাল্টন-বাজারের ইতিহাস আমি যেভাবে মহুয়া-মিলনের নামে চালিয়েছি, রুমাবাঈকে নিয়ে গল্প লিখতে হলেও সেই পন্থাই অনুসরণ করতে পারতাম। কিন্তু যে স্টেটেরই নাম দিই না কেন, কে বলতে পারে সেখানেই রুমাবাঈ ধরনের অন্য কোনো চরিত্র আছে কিনা। গল্পকে নিছক গল্প হিসেবে স্বীকার করেন না, এমন পাঠকের অভাব নেই এবং সে কারণেই সম্প্রতি আমি একটু বিপদেও পড়েছিলাম।

রুমাবাঈ অবশ্য আজ আর বেঁচে নেই, থাকলেও এ গল্প পড়ে হয়তো খুশীই হতেন। কিন্তু উষ্মা প্রকাশ পেতো রাজা প্রতাপ-কিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের ব্যবহারে।

আশ্চর্য এই যে, আনারবাগের পঞ্চান্ন বছরের আধ-পাগলা রাজা বাহাদুরের কাছে রুমাবাঈয়ের চরিত্রের কোনো দিকটাই অজ্ঞাত ছিল না।

রাজা বাহাদুরের খাস আস্তাবলের হেড্ সহিসের সুন্দরী স্ত্রী জাহানারার সঙ্গে প্রতাপকিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহের নাম জড়িয়ে গোপনে হাসাহাসি করতো অনেকে এবং পরপর নানা ঘটনার সূত্রে

জুড়ে কিউ ই ডি লিখে প্রমাণ করে দিতো যে রুমাবাঈ আসলে রাজা বাহাদুরের মেয়ে।

হলেও আপত্তি করবার কিছু ছিল না। রূপে এবং বন্যা বাহুল্য যৌবনে, রুমাবাঈ ছিল একেবারে ষোল আনা রাজকন্যে।

তখন পর্যন্ত আমি রুমাবাঈ নামটাই শুনেছি, স্বচক্ষে তাঁর দর্শন পাবার সৌভাগ্য হয় নি। কারণ, আমি ইনামপুর স্টেটের প্রজা ছিলাম না। আনারবাগের নতুন সুগার ফ্যাক্টরীতে চাকরি নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে।

এখন অবশ্য আমি ইনামপুর স্টেটের পাইক-বরকন্দাজের নাগালের বাইরে এবং রাজা বাহাদুরের প্রতাপও এখন শুধু তাঁর নামেই, তাঁর স্বেচ্ছাচারের আইন এখন ঠুঁটো হয়ে গেছে। তবু তাঁকে ভয় করার একটি কারণ আছে। যে হেভি কেমিক্যাল্স ফ্যাক্টরীটায় আমি এখন চাকরি করছি, তার রেসিডেন্ট ডিরেক্টর কালে সাহেব প্রতাপকিঙ্করের পিয়ারের দোস্ত।

সুপারিশ পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি লোকটা যে কে তা রাজা বাহাদুর স্বচক্ষে কোনোদিন দেখেন নি। স্বচক্ষে তিনি কিছুই দেখতেন না। ফরসা গোলগাল চেহারা, বাঁকীটা ভোজপুরী দারোয়ানের মত। আর সেই শরীরের ওপর এক রাশ মখমলের রাজবেশ, মখমলের ওপর সোনালী জরি, লাল-নীল নানা দুর্মূল্য পাথর চুমকির মতো বসানো। সিংহাসনে বসে মাথায় মুকুট পরে একটা ছবি তুলিয়েছিলেন প্রতাপকিঙ্কর, আর সেই ছবিটাই তিন রঙ্গে ছাপা ক্যালেণ্ডার হয়ে আমাদের সকলের মেসে কোয়ার্টারে শোভা পেতো।

তাই রাজা বাহাদুরকে আমরা সকলেই চিনতাম। চিনতাম না রুমাবাঈকে।

সোদপুর শুক্লা তিথির জোছনার রাতে শরীরে মসমল জড়িয়ে কোথায় রোমান্সের পক্ষীরাজে উড়ে বেড়াবার কথা, তা নয় হঠাৎ

কেমন যেন বেতো বুড়োর মতো খিটখিটে হয়ে উঠেছিলাম। হয়তো চাকরির ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েই।

একশো পঁচিশ টাকা মাইনেতে বহাল হয়ে গিয়েছিলাম আনারবাগের সুগার ফ্যাক্টরীতে, যে কারখানার স্বত্বাধিকারী ছিলেন স্বয়ং রাজা প্রতাপকিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর। আর যেহেতু স্টেটের দেওয়ানজী মিস্টার রায় এবং চিনির কারখানার মাদ্রাজী ম্যানেজার মিস্টার কৃষ্ণস্বামী, এ দুজনের একজনেরও আশ্রিত লোক ছিলাম না সেইজন্যেই হয়তো স্থায়ীভাবে আমাকে রাতের শীফ্‌টে ফেলে দিয়েছিলেন য়্যাসিস্টেণ্ট প্রোডাকশন ম্যানেজার করিম সাহেব।

ডাকে-পাওয়া নিয়োগপত্রটি নিয়ে যেদিন প্রথম হাজির হলাম করিম সাহেবের কামরায়, সেদিনই টের পেয়েছিলাম, কপালে কি দুর্ভোগ আছে।

ফাইল ঘেঁটে আমার দরখাস্তটার ওপর চোখ বুলিয়ে কি যেন খুঁজে পেলেন না করিম সাহেব। অন্তত তাঁর মুখচোখ দেখে তাই মনে হয়েছিল।

আর সেইজন্যেই বোধ হয় ভুরু কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কার লোক তুমি?

প্রশ্নটা বুঝতে পারি না। কিন্তু বুঝতে না পারলে যে শুনতে পাই নি এমন একটা মুখভাব করে বেগ ইওর পার্ডেন বলতে হয় সে বিদ্যে রপ্ত ছিল।

করিম সাহেব উল্টে চটেই গেলেন।

—কানে কম শোনো নাকি? কার লোক তাই জিজ্ঞেস করছি?

বললাম, আজ্ঞে তা তো জানি না, কাগজে কেমিস্ট চাই বিজ্ঞাপন দেখে এপ্লাই করেছিলাম।

—আই সী। অস্ফুটে বললেন করিম সাহেব, তারপর আমার নিয়োগপত্রের এক কোণে লাল কালিতে লিখলেন, রেকমেনডেড ফর নাইট শীফ্‌ট। লিখে নীচে নাম সই করে বললেন, ঐ যে গলাবন্ধ কালো কোট পরে কেরানীবাবু বসে আছেন, ওর কাছে যাও। গিয়েছিলাম এবং যাওয়ার পর সেই যে শীফ্‌টের ইনচার্জের সঙ্গে তিনি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তারপর থেকে একদিনের জন্যেও দিনের শীফ্‌টে বদলি হতে পাই নি।

ফলে সারারাত ডিউটি দিয়ে এসে সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোতাম, আনারবাগের লোকজনের সঙ্গে ভালো করে আলাপ করার সুযোগ পাই নি। তাই বোধ হয় সেদিন ঘুরন্ত পিনিয়নটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন একটা অসহ্য বিতৃষ্ণা জমা হচ্ছিল মনের মধ্যে।

কারখানাটা ছিল বেশ খানিকটা উঁচু টিলার গায়ে। কিছুটা সমতল জমি কারখানার এলাকা পার হয়ে, তারপর ঢালু নেমে গেছে নীচের কুলিকামিনদের বস্তী অবধি।

একটা মোটা জলের পাইপ অতিকায় একটা অজগরের মতো নেমে এসেছে ওপরের রিজারভয়ের থেকে, এসে ঢুকেছে কারখানার ভেতরে। কুলিমজুরের হট্টগোল এড়িয়ে বাইরে বসে ছিলাম পাইপটার ওপর। বসে বসে দেখছিলাম আনারবাগের রূপ।

পূবের সীমান্তে যতদূর চোখ যায় শুধুই হিমাচলের আঁকাবাঁকা তরঙ্গ। যেন সুদীর্ঘ একখানি শ্যামল শাড়ী বিছানো আছে আকাশের গায়ে। জ্যোৎস্নার রোশনাই লেগে তুষারশুভ্র হিমচূড়ার রেখাটি যেন ফিকে রূপোলী রঙের পাড়। কোনো দৈত্যের কঙ্কালের মতো চারপায়া উঁচু রিজারভয়ারের ধোঁয়াটে আকাশের গায়ে বড়ো এক টিপ চাঁদ।

আনমনা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম সেদিকে।

মেশিন চলছে। কেরিয়ার থেকে আখের রাশি ধীরে ধীরে গিয়ে ক্ষিদে মেটাচ্ছে রসলোভী যন্ত্রের।

অবিরত শোঁ-শোঁ শব্দ, আর পিনিয়নের মূর্ছনা। পিনিয়নের দাঁতে দুটি বিশাল হিংস্র চাকার মধ্যে রাশি রাশি আখ মাড়াই হচ্ছে, একদিকে জমা হচ্ছে ছোবড়ার রাশ, আর অন্যদিকে একটি উন্মুক্ত চোঙা বেয়ে ঢলে পড়ছে আখের রস।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একটি ছায়াশরীর এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে।

এতখানি দূর থেকে স্পষ্ট দেখা গেল না, কিন্তু লোকটি যেন এক আঁজলা রস তুলে পান করবার জন্যে ঝুঁকে পড়লো।

কুলিমজুরদের সঙ্গে কাজ করে করে মেজাজটাও হয়ে উঠেছিল রুক্ষ।

চিৎকার করে উঠলাম।—এই বেকুফ!

ছায়াশরীর সোজা হয়ে দাঁড়ালো, শব্দ লক্ষ্য করে তাকালো আমার দিকে।

এগিয়ে যেতে যেতে রুক্ষস্বরেই বললাম, কি করছিলে?

কিন্তু ততক্ষণে আমি আরো কাছে পৌঁছে গেছি। চাঁদের আলোয় তার শরীরের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুরুষ নয়।

বব্ করা নরম চুল, উলের আঁট ব্লাউজ, ট্রাউজারের কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

—বলছিলে কিছু? পরিষ্কার উর্দুতে নারীকণ্ঠের শান্ত প্রশ্ন শুনলাম।

গলার স্বর আপনা থেকেই নরম হলো, বললাম, কি করছিলেন আপনি? এ রসে হাত দেওয়া বে-আইনী।

মেয়েটি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো।—বে-আইনী? বলে চুপ করলে মেয়েটি। আমি কে জানো হে ছোকরা? আমি রুমাবাঈ।

রুমাবাঈ। সমস্ত শরীরে যেন শিহরণ খেলে গেল। আর পরমুহূর্তেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। অস্বস্তি, না ভয়?

আপনা থেকেই গলার স্বর শান্ত হলো। যন্ত্রচালিতের মতো তিনবার কুর্নিশ করে তিন পা পিছিয়ে এলাম, সন্ধ্যের সময় একদিন দেওয়ানজী মিস্টার রায় কারখানা দেখতে আসায় ম্যানেজার মিস্টার কৃষ্ণস্বামী যেভাবে কুর্নিশ করেছিলেন ঠিক সেইভাবে।

তারপর মাথা তুলে দেখলাম রুমাবাঈ যেন কৌতুকের হাসি হাসছেন। হাসতে হাসতেই বললেন, নতুন এসেছো, না? কোথাকার লোক তুমি?

—বেঙ্গল। ছোট্ট একটি কথা, তাও যেন জিভে জড়িয়ে গেল।

—তাই বলো। কিন্তু একটু ভদ্র হতে চেষ্টা কোরো। কারণ এটা বাংলা দেশ নয়, আর রুমাবাঈয়ের ইচ্ছাটাই এখানে আইন।

এত চেষ্টা করেও হাত দুটোকে পরস্পর থেকে পৃথক রাখতে পারলাম না, হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, এ রস তো খেতে পারবেন না, এতে ধুলো-বালি-ময়লা মিশে আছে, একটু অপেক্ষা করেন তো ভালো টাটকা রস এনে দিচ্ছি। বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছুটে গেলাম।

মিনিট দুই পরে কাঁচের গ্লাসে টাটকা এবং ছাঁকা পরিষ্কার রস নিয়ে যখন ফিরে এলাম তখন রুমাবাঈ উধাও। এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলাম প্যালেসের দিকে এঁকেবেঁকে যে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে সেই রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে একখানা মোটরবাইক। আর মোটরবাইকের আরোহীর দেহরেখাটা যেন রুমাবাঈয়ের মনে হলো।

সে রাত্রিতে আর কাজে মন বসলো না। একটি নাম কেবলই

ঘুরে বেড়ালো কানের চারপাশে, বিভীষিকার মতো। রুমাবাঈ! রুমাবাঈ!

কারখানার প্রতিটি কর্মীর কাছে কতবার শুনেছি এ নাম। কত গোপন রসিকতা, কত অবোধ রহস্য। ভয় আর ভালবাসা। বিদ্যুতের মতো যার আকর্ষণ। বিদ্যুতের মতোই যার চোখে মৃত্যুর পরোয়ানা।

সমস্ত শরীরে জ্বরাতুর উত্তাপ আর মনে দুশ্চিন্তার পাথর নিয়ে বাসায় ফিরেছিলাম সে রাত্রে।

তারপর দুপুরে এক সময় ডাক পড়েছিল করিম সাহেবের কাছে।

ভয়ে ভয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

করিম সাহেব একরাশ কাগজপত্রের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে বসে ছিলেন, মাথা না তুলেই বললেন, নাইট শীফটে তুমি ছাড়া আর কোনো বাঙালী আছে?

বললাম, না স্যার।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন করিম সাহেব, মাথা তুললেন না। তারপর এক সময় হঠাৎ বললেন, তোমার সাহস তো কম নয়, ম্যানেজারের কাছে কম্‌প্লেন করেছো আমার নামে?

—কম্‌প্লেন করেছি? বিস্মিত হলাম।

—কর নি? নাইট শীফটে রেখেছি বলে দরখাস্ত কর নি তুমি?

—না স্যার।

—হুঁ। আচ্ছা যাও, কাল থেকে ডে শীফটে কাজ করবে। করিম সাহেব এবারেও মাথা না তুলেই বললেন।

চলে আসছিলাম, হঠাৎ বললেন, মিস্টার কৃষ্ণস্বামীর সঙ্গে দেখা করো।

দুর্বোধ্য বিস্ময় আর আশঙ্কার অনুরণন বাজলো মনের কোণে।

তবু ভয়ে ভয়ে গিয়ে দেখা করতে হলো ম্যানেজার মিস্টার কৃষ্ণস্বামীর সঙ্গে।

নমস্কার করে বললাম, ডেকেছেন আমাকে?

অনেকক্ষণ ধরে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে মিস্টার কৃষ্ণস্বামী বললেন, দেওয়ানজী মিস্টার রায় তোমার রিলেটিভ? আগে বল নি কেন?

বললাম, আজ্ঞে না, দেওয়ানজী আমাকে চেনেনও না।

কৃষ্ণস্বামী হাসলেন। চেনেন না? অথচ তোমাকে ডে শীফ্‌টে বদলি করবার জন্য ফোন করেছিলেন আমাকে?

বললাম, বিশ্বাস করুন—

—রাতের শীফ্‌টে তো তুমিই একমাত্র বাঙালী?

বললাম, হ্যাঁ স্যার।

কৃষ্ণস্বামী কি যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা যাও। কাল থেকে ডে শীফ্‌টে।

চলে এলাম। কিন্তু যে খবর শুনে খুশী হয়ে ফিরে আসার কথা, সে খবর শুনেই কেমন আতঙ্ক বোধ করলাম।

দেওয়ানজী মিস্টার রায়। তিনি বলেছেন আমাকে দিনের শীফ্‌টে বদলি করতে? কেন? আমাকে চিনলেনই বা কি করে? ভাবলাম, কে জানে, আমি যে বাঙালী সে খবর হয়তো তাঁর কানে গেছে। তাই তিনি রাত্রির নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন আমাকে। কিংবা, কে জানে, দেওয়ানজীর সুপারিশে চাকরি-পাওয়া বীরেন বক্সীই হয়তো সহকর্মীর জন্যে এ কাজটুকু করে দিয়েছে।

দিনের পাল্লায় আমি এবং বীরেন বক্সী ছাড়াও আরো পাঁচজন বাঙালী ছিল। তাই কাজের সঙ্গে আড্ডা গল্পগুজব যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গিয়েছিল। কৃষ্ণস্বামী এবং করিম সাহেব

সাধারণত দপ্তরেই বসে থাকতেন, দু-এক মিনিটের জন্যে যদি-বা আসতেন তো বাতাসের আগে সাবধানবাণী পৌঁছে যেত।

সেদিনও অমনি কানে কানে খবর এলো, রুমাবাঈ আসছে, রুমাবাঈ আসছে। সঙ্গে দেওয়ানজী।

মিনিট কয়েক পরে কৃষ্ণস্বামী এবং করিম সাহেবের সশ্রদ্ধ পথপ্রদর্শনকে তাচ্ছিল্যভাবে উপেক্ষা করতে করতে রুমাবাঈ এগিয়ে এলেন। মেসিন নয়, মানুষগুলোর দিকেই যেন তাঁর চোখ। কিন্তু ছিমছাম চেহারার দেওয়ানজীর দৃষ্টি কাজের দিকে। আমরা দেখলাম শুধু রুমাবাঈকে।

সেদিন রাত্রিতে রুমাবাঈকে দেখেছিলাম, আর এ রূপ যেন ভিন্নজনের। দামী রেশমের শালোয়ার আর পাঞ্জাবীতে তাজা রক্তের বর্ণাভা, সলমা চুমকির ঝলমলানি আর গোলাপী ওড়নার প্রান্ত লুটিয়ে আছে যৌবনোদ্দীপ্ত বুকের ওপর। চোখের নীচে সূক্ষ্ম সুর্মার লোভানি। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দৃষ্টি, সুডৌল হাত যেন গোলাপের পাপড়ি দিয়ে মাজা, যৌবনপুষ্ট জঙ্ঘায় অস্থির চঞ্চলতা।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়লো, কাছে এগিয়ে এলেন রুমাবাঈ। কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বিজন আচার্যের দিকে দৃষ্টি ফিরলো তাঁর।

এই ছোকরা, শোনো এদিকে।

বিজন এগিয়ে এলো, কুর্নিশ করে সামনে দাঁড়ালো।

রুমাবাঈ জিজ্ঞেস করলেন, কি নাম তোমার ?

নাম বললে বিজন।

আমাদের ফ্যাক্টরীর তৈরী এক মুঠো চিনি দেখালেন মিস্টার কৃষ্ণস্বামী।

সন্তুষ্ট হলেন না রুমাবাঈ।—এ তো স্রেফ ধুলো, এর চেয়ে বড়ো দানা হয় না ?

জাভা চিনির নমুনাটা কারখানার তৈরী বলে দেখিয়ে দিলেন কৃষ্ণস্বামী। বললেন, দুরকমই হয়।

দেখে সন্তুষ্ট হলেন রুমাবাঈ। ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন।

আর ওরা সদলবলে চলে যাওয়ার পর ঠাট্টা শুরু করলাম আমরা বিজনকে নিয়ে।

আমার চেয়ে বয়েসে ছোটই ছিল বিজন। কিন্তু শুধু সেই জন্যেই নয়, বিজনের ওপর আমাদের সকলেরই কেমন একটা দুর্বলতা ছিল অন্য কারণে। রুমাবাঈকে দোষ দেওয়া যায় না, কোনো নারীমন বিজন আচার্যের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, আর সে চেহারার চুল এবং চোখে কি অনুপম মাধুর্য। অথচ পোশাক-পরিচ্ছদ নোংরা, সব সময়েই মেশিনের তেল আর কালি লেগে আছে। তার কারণ, বিজনের চাকরিটা ছিল অতি নগণ্য। মেশিন পরিষ্কার করা, দাঁতে দাঁতে মোবিল ঢালা; মাইনে ছিল পঞ্চাশ টাকা, সে বাজারেও তা লোভনীয় ছিল বলেই বাংলাদেশ ছেড়ে এত দূর আসতে হয়েছিল তাকে।

কিন্তু আমাদের প্রাদেশিক আভিজাত্যে ঘা লাগতো তার জন্যে। বিজনের চেয়েও তো কম কোয়ালিফায়েড লোক ছিল ইনামপুর স্টেটের সুগার ফ্যাক্টরীতে। অথচ বিজনের বেলাতেই কিনা এমন চাকরি?

সেই বিজনকে ডেকে কথা বলেছেন রুমাবাঈ, সুতরাং রসিকতা করতে ছাড়বো কেন আমরা।

বললাম, দেখিস ভাই, সেদিন রাত্তিরে খুব ফাঁড়া কেটে গেছে, বিপদে পড়লে বাঁচাস বিজন।

শুধু বক্সী হেসে বললে, সাবধান বিজন, রুমাবাঈ কিন্তু একটি আসল 'কেন ক্রাশার।' আখ হয়ে ঢুকলে—

নিষ্কাশিত-রস ছিবড়ের স্তূপটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হাসলো বক্সী।

রহমান, আয়ার, মিশ্র কেউই ঠাট্টা করতে কসুর করলে না।

কিন্তু ঠাট্টা যে সত্যি হতে পারে তা আমরা কেউ কল্পনাও করি নি।

সোনারবাগের একটা দিকের নাম ছিল বাঙালীটোলা। স্টেটের বাঙালী চাকুরেরা সকলেই থাকতেন সেই পাড়ায়, একমাত্র দেওয়ানজী মিস্টার রায় ছাড়া। বাঙালীটোলার কালী মন্দিরের পাশেই ছিল একটা মেস, আর সেই মেসে আমরা জন পঁচিশেক লোক থাকতাম। সুগার ফ্যাক্টরীর সাতজন, হেভি কেমিক্যাল-এর কয়েকজন, আর্ট স্কুলের একজন শিক্ষক, মেয়েদের কলেজের একজন কেরানী এবং আরো যেন কে কে। বৃহস্পতিবারটা ছিল আমাদের ছুটির দিন।

সকালের চা আর ডাকযোগে-আসা বাসি খবরের কাগজ নিয়ে বারান্দায় বসে আছি আমরা, হঠাৎ লাল রঙের টু-সীটারখানা দেখা দিল।

শোঁ করে বাঁক নিয়ে একেবারে আমাদের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা।

দেখলাম, স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন রুমাবাঈ।

মেসের দারোয়ানটা ছুটে গেল, ফিরে এলো তটস্থ হয়ে। আচরিয়া সাহেবকে ডাকছেন রুমাবাঈ।

হাঁটুতে হাঁটু ঠেকলো বিজনের, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দাঁড়াল বিজন, আর আমাদের চোখের সামনেই বিজনকে পাশে বসিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম সকলে। এমন ঘটনা যেন গল্পেই ঘটে। গল্পেও নয়। শুধু দুর্নামী রটনায়।

বক্সী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, লাজ-লজ্জার বালাই নেই। একেবারে—

জানি না, বক্সী হয়তো এখনো আনাবাগেই আছে, সুতরাং তার শেষ কথাটা না বলাই ভালো, কিন্তু মানুষ কথায় আর কতটুকু প্রকাশ করতে পারে, মনের পুঞ্জীভূত ঘৃণাকে ভাষা দেবার মতো বাহন হয়তো এখনো আবিষ্কৃত হয় নি।

রুমাবাঈ! যে নামটা এতদিন ছিল বিস্ময়ের, আশঙ্কার, আতঙ্কের কণ্ঠে উচ্চারণ করবার মতো, সেই নাম যেন ঘৃণার মন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। আর দুঃখ হলো বিজনের জন্যে। ওর কি দোষ, কি করতে পারে ও বেচারী, এই অনাচারের রাজত্বে।

কিন্তু আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি নি, কখন থেকে বিজনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম।

প্রথম দিন বিজন ফিরে আসার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোথায় গিয়েছিলি, কেন নিয়ে গেল?

শুনে হেসেছিল বিজন।—তোমরা যা ভাবছো তেমন কিছু নয়।

আমরা কিন্তু বিশ্বাস করি নি। না করারই কথা। দিনে দিনে পরিবর্তন লক্ষ্য করতাম বিজনের। পোশাক-পরিচ্ছদে সব সময়েই ফিটফাট হয়ে থাকতো বিজন। কোনদিন নিজেই আসতেন রুমাবাঈ, কোনদিন বা গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন।

প্যালেসের দর্জি শেখ সাহেব আসতো কোনো কোনোদিন, আর আমরা যেভাবে কুর্নিশ করেছিলাম রুমাবাঈকে, সেইভাবেই বিজন আচার্যকে কুর্নিশ করতো দর্জিটা।

দেখে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতাম আমরা। কিন্তু বিজনের সামনে হাসিঠাট্টা করতে সাহস হত না। বুঝতে পারি না, আপনা থেকেই বিজনকে ভয় পেতে শুরু করেছি আমরা।

ইতিমধ্যে ধাপে ধাপে চাকরিতে উন্নতি হচ্ছিল বিজনের। মেশিন-ইন-চার্জ থেকে সুপারভাইজার, সুপারভাইজার থেকে প্রোডাশন ম্যানেজার। যিনি প্রোডাকশন ম্যানেজার ছিলেন তাঁকে বদলি করে দেওয়া হলো হেভি কেমিক্যালসের ফ্যাক্টরীতে। আব আমি হলাম ব্লিচিং ডিপার্টমেণ্টের কেমিস্ট-ইন-চার্জ। মাইনে এক পয়সা বাড়লো না, বাড়লো কাজ।

সেইজন্যেই যত রাগ গিয়ে পড়লো বিজনের ওপর। যার জন্য সহানুভূতি দেখাতাম, তাকেই ঈর্ষা করতে শুরু করলাম।

সহানুভূতি থেকে ঘৃণা, ঘৃণা থেকে ভয়, ভয় থেকে ঈর্ষা। আশ্চর্য মানুষের মন! কথাবার্তা একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। প্রয়োজনের সময় যে দু-চার কথা বলতাম তাও মেপেজুখে। যে অন্তরঙ্গতার সূত্রে বাঁধা ছিলাম আমরা তা থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল বিজন!

মেস ছেড়ে অন্য একটা বাড়িতে উঠে গেল ও, আর আমরা একজোট হলাম ওর বিরুদ্ধে। আলোচনা করতাম, ষড়যন্ত্র করতাম কিভাবে জব্দ করা যায় বিজনকে।

নাইট শীফটের সকলেই ছিল আমার পরিচিত। তারা জানতো, প্রোডাকশন ম্যানেজার হওয়ার যোগ্যতা নেই বিজনের। তার না ছিল শিক্ষা, না অভিজ্ঞতা। তবু কেন সে সকলের মাথার উপর চড়ে বসে থাকবে!

এ. পি. এম. ছিলেন ধুরন্ধর লোক। বিজনের ওপর তিনিও ছিলেন অসন্তুষ্ট। তাই আমাদের কথা শুনে অসহযোগ শুরু করলেন তিনি। বিজনের আদেশটুকুই মানতেন, নিজের বিদ্যে-

বুদ্ধির সাজেশন দিয়ে এতটুকু উপকার করতেন না। ফলে, প্রোডাকশন কমতে লাগলো। এ ছাড়া, আজ এ মেশিন বন্ধ, কাল ওটা খারাপ। আর কেমিস্টের কারসাজিতে যা তৈরী হতে শুরু হলো, কাশীর চিনিও তার তুলনায় উঁচু দরের।

দ্রুত উন্নতির তালে তালে চলতে পারলো না বিজন, মেজাজ হয়ে উঠলো রুক্ষ।

বিজনের ব্যবহারে কুলিমজুরদের মধ্যেও অসন্তোষের বীজ ছড়িয়ে পড়লো।

তবু টনক নড়লো না ম্যানেজারের। খোদ রুমাবাঈ যার সহায়, তাকে আমরা অপদস্ত করবো কি করে।

ওদের সন্ধ্যাভিসার জ্বালা ধরিয়ে দিতো আমাদের মনে। কোনোদিন দেখতাম গুলাব মহলের ঝাউবাগানে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে বিজন আর রুমাবাঈ। কোনোদিন বা পাহাড়ী ঝরনাটার ধারে জলে-ভাসা পাথরে বসে গল্পগুজবে মত্ত।

আশ্চর্য চোখঝলসানো রূপ ছিল রুমাবাঈয়ের। আসমানী স্বচ্ছ শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে জ্বলতো তার যৌবনের উদ্দামতা, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য।

একদিন দেখেছিলাম, সঙ্কীর্ণ গিরিপথ বেয়ে চলেছে একজোড়া আরবী ঘোড়া। ফুটফুটে ঘোড়াটার পিঠে দৃপ্ত ভঙ্গীতে বসে আছেন রুমাবাঈ।

আরেকদিন দূর থেকে দেখেছিলাম, সুইমিং কস্টিউম পরে স্নান করছেন রুমাবাঈ, ঝরনার জলে নেমে। সে কি হাসাহাসি, পরস্পরের গায়ে জল ছিটিয়ে সাঁতার কেটে দূরে পালানো।

স্নান সেরে একটি শ্বেতাভ পাথরের ওপর এসে দাঁড়ালো রুমাবাঈ। নারীর শরীর নয়, যেন জ্বলন্ত কামনা।

ধরা পড়ার ভয়ে দূর থেকে দেখেই পালিয়ে এসেছিলাম সেদিন।

কিন্তু বিজন পালিয়ে আসতে পারে নি।

ও হয়তো সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিল রুমাবাঈকে। তা না হলে কি মোতিকুমারীকে বিয়ে করতে রাজী হত ও?

খবরটা এনেছিল বক্সী। শুনছো ব্যাপার? বিজনের সঙ্গে মোতিকুমারীর বিয়ে দিতে চায় রুমাবাঈ।

—মোতিকুমারী কে? প্রশ্ন করেছিলাম।

বক্সী বিস্মিত হয়েছিল। —সে কি? চেনো না তাকে? স্টেটের মেডিক্যাল অফিসারের মেয়ে। রোগা আর কুৎসিত চেহারার মেয়েটা, যে মেয়েদের স্কুলে টিচারী করে। দু-বেলা তো যায় এখান দিয়েই।

চিনতে পেরেছিলাম। যৌবন বয়সেও যে নারীদেহ কত কুৎসিত হতে পারে মোতিকুমারীকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

তাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, বিয়ে দিয়ে রুমাবাঈয়ের লাভ?

বক্সী হেসেছিল, উত্তর দেয় নি।

তারপর বলেছিল, রাজকন্যার খেয়াল। তোমাকে যে রাতের শীফ্‌ট থেকে দিনে বদলি করিয়েছিল, কেন? লাভ ছিল ওর?

—সে কি? রুমাবাঈ বদলি করিয়েছিল? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

বক্সী শুনে হাসলো। —জানতে না?

বললাম, কোন খবরটাই বা আমরা জানি। কিন্তু মোতি-কুমারীর সঙ্গে যদি বিজনের বিয়ে হয় তা হলে খুশী হবো। কিংবা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে যদি খোঁড়া হয়।

বক্সীও হেসেছিল। —হবে, হবে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

যে-কোনো ভাবে বিজনের ক্ষতি করতে পারলে, বিজনকে অসুখী দেখতে পেলে তখন সত্যিই খুশী হয়ে উঠতাম। আমাদের কলের কাছেই ও তখন চক্ষুশূল।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে বিজনও যে রুমাবাঈয়ের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে, জানতাম না।

সন্দেহ হলো যেদিন শুনলাম চিনির কারখানা থেকে হেভি কেমিক্যালসে বদলি হয়েছে বিজন।

বক্সী বললো, শুনেছো খবর? পাঁচশো থেকে তিনশো টাকায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজনকে।

সত্যি?

আজ স্বীকার করতে লজ্জা হয়, কিন্তু সেদিন সত্যিই খুশী হয়েছিলাম। আমাদের সমস্ত পরাজয়, সব গ্লানি যেন মুছে গেল এই একটি খবরে।

ঠিক যেমনভাবে ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরে উঠেছিল, তেমনি ধাপে ধাপে নামতে শুরু করলো ও। আর আমরা সকলেই তার দুর্দশা দেখে আনন্দে আত্মহারা হলাম। কারণটা অজানা রইলো না। রাজা প্রতাপকিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর তখন তিনখানা ডাকোটা বিমান কিনেছেন, আনারবাগ থেকে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে। আর এই ডাকোটা বিমানের পাইলট হয়ে যে তিনজন নবাগতের আগমন হলো তাদের একজন হলো নিহাল। পাঞ্জাবী হিন্দু অর্থাৎ দাড়িগোঁফ চাঁছা সুশ্রী চেহারা, যেমন সুশ্রী তেমনি স্মার্ট।

এই নিহালের সঙ্গে প্রায়ই আকাশ-বিহারে যেতে শুরু করলেন রুমাবাঈ। শুনতে পেতাম রুমাবাঈ নিজেও নাকি প্লেন চালানো শিখছেন।

অসম্ভব মনে হত না, কারণ রুমাবাঈয়ের পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব ছিল না। ধুলিয়াবাবার আশ্রমের পাশ দিয়ে যে শীর্ণ খাড়াই পথটা পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে টুমুরিয়ার দিকে উঠে গেছে সেই দুর্গম পথ বেয়ে যেদিন ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখেছিলাম

রুমাবাঈকে, তার পর থেকে ধারণা হয়েছিল, রুমাবাঈয়ের পক্ষে সবই সম্ভব।

বৈমানিক নিহালের সঙ্গে মাঝে মাঝে রুমাবাঈকে দেখতে পেতাম আংরেজবাজারে। কখনো-বা ইম্পিরিয়েল ক্লাবের টেনিস লনে।

দেখে খুশী হতাম আমরা, খুশী হতাম এই ভেবে যে, নিহাল বিজন নয়।

বিজন সেদিন হেভি কেমিক্যালস্ থেকে সুগার ফ্যাক্টরীতে ফিরে এলো, কৌতুকের হাসি হেসে বললাম, দেখছিস্ বক্সী, বাছাধনের মুখটা একেবারে চুন!

বক্সী হেসেছিল।—তুদিনের জন্যে খুব নবাবী করে নিলো যা হোক্। ভাগ্যিস্ দেওয়ানজীর কানে তুলেছিলাম।

—তার মানে?

বক্সী হেসে বলছিল, রুমাবাঈ যদি কাউকে ভয় করে তো সে এক দেওয়ানজী।

যে বিজনকে দেখলে একদিন সকলেই ভয় পেতো, সে কোনোকালেই হাতি ছিল না, দ্বিতীয় কাদায় পড়েছে। সুতরাং অন্য সকলেই আড়ালে টীকা-টিপ্পনি কাটতে শুরু করলো। প্রথম প্রথম আড়ালে, কিছুটা শুনিয়ে শুনিয়েই।

একদিন আবার মেসবাড়িতেই ফিরে এলো বিজন। আগের মতোই মেলামেশা করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু স্বাভাবিক হতে পারলাম না আমরা। কোথায় যেন চিড় খেয়েছে, জোড়া লাগানো গেল না।

ওকে এড়িয়ে চলতাম। ঘৃণা নয়, কেমন যেন কৌতুক বোধ করতাম ওর কথা উঠলেই। ওর পরাজয় যেন আমাদেরই জয়তিলক।

তবু মনের মধ্যে ঔৎসুক্য গুমরে মরছিল, তাই চেপে রাখতে

পারলাম না। একদিন বিজনকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন এমন হলো বল তো বিজন ?

বিষণ্ণ হাসি হাসলে ও। বললে, কি জানি। খানিক চুপ করে বললে, হয়তো মোতিকুমারীর জন্যে।

বিস্ময়ে মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে।

দুঃখের হাসি হেসে বিজন বললে, মানুষ যে কখন কাকে ঈর্ষা করে !

ঈর্ষা ! যেন নিজের মনেরই প্রতিধ্বনি শুনলাম। সত্যিই তো, এই বিজনকেই একদিন ঈর্ষা করতে শুরু করেছিলাম আমরা। ঘৃণা করতাম ? হ্যাঁ, ঘৃণা—কিন্তু সে তো ঐ ঈর্ষা থেকেই।

বিজন চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললে, সেদিন এক চায়ের আসরে ডেকেছিল রুমা। অনেকে এসেছিল, তার সঙ্গে মেয়েদের ইস্কুলের মাস্টারনী মোতিকুমারী। দেখেছো তুমি তাকে ?

—দেখেছি।

বিজন বলল, ওর চেয়ে কুৎসিত কোনো মেয়ে চোখে পড়েছে তোমার ? পড়ে নি। তাই হয়তো কেউই ওর সঙ্গে কথা বলছিলো না। মেয়েপুরুষ আরো অনেকে ছিল সেদিন, সকলেই গল্পগুজব করছিল, হৈ-হুল্লোড়ে মেতেছিল। আর মোতিকুমারী উপেক্ষিত হয়ে এককোণে বসে ছিল চুপ করে। অথচ রুমাবাঈয়ের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করার সাহস ছিল না তার। দেখে মায়া হলো, গিয়ে ওর পাশের চেয়ারে বসলাম।

উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম, তারপর ?

—তারপর মাঝেসাঝে দেখা হলে দু-একটা কথা বলতাম, হাসি ফুটতো ওর মুখে। ওর হাসি দেখে আমিও যেন খুশী হতাম। সেকথা বলতাম রুমাকে। শুনে রুমা একদিন বললে, তুমি ওকে

বিয়ে করো···কি জবাব দেবো এ-কথার। বললাম, অসম্ভব। শুনে যে চোখে তাকালো রুমা, সে-চোখ আমি কোনোদিন দেখি নি।

—তারপর? যেন কোনো রোমহর্ষক কাহিনী শুনছি এমনি উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করলাম।

বিজন বললে, তারপর তো তোমরা জানো।

বললাম, রাজী হলি না কেন? রুমাবাঈয়ের খেয়াল, রাজী হলে হয়তো ভুলেও যেতো।

বিষণ্ণ দেখালো বিজনকে। বললে, রাজী হয়েছিলাম। ভয়ে নয়, সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিলাম মোতিকুমারীকে। রুমার নির্যাতন যত বাড়তে লাগল ততই যেন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম মোতিকুমারীর সঙ্গে, তারপর যেদিন বললাম, মোতিকুমারীকে আমি বিয়ে করছি, সেদিন —এই দেখো—

বলে জামাটা তুলে বিজন ওর পিঠটা দেখালে।

শিউরে উঠলাম। ফরসা পিঠের ওপর গোটাকয়েক কালসিটে দাগ, যেন ক্রোধান্ধ কেউ চাবুকের পর চাবুক বসিয়েছে সেখানে।

বিস্মিত হয়ে তাকালাম, সে কি? কেন?

বিজন হাসলে।—আমি জানতাম, ঈর্ষায় জ্বলছে রুমা, কিন্তু স্পষ্ট করে বলতে পারছে না। অথচ ওর সন্দেহ যে সত্যি তার প্রমাণ না পেলে যেন শান্তি নেই ওর। কিন্তু তোমাকে বলছি আমি, বিশ্বাস করো, রুমার চোখের সামনেই আমি মতি-কুমারীকে বিয়ে করবো। শেষের কথাগুলো এত দৃঢ়তার সঙ্গে বললে ও, যেন নিজের মনকেই বলছে।

বিয়ে সত্যিই হলো একদিন। কিন্তু রুমাবাঈয়ের চোখের সামনে নয়। বাঙালীটোলার কালীবাড়িতে যখন বিজন আর মোতিকুমারী মন্ত্র উচ্চারণ করছে সেই সময় নিহালের সঙ্গে রুমাবাঈ আকাশবিহারে উঠছেন। আর তার কিছুক্ষণ পরেই

দেখা গেল সেই ডাকোটা বিমানখানায় আগুন লেগেছে। মুহূর্তের মধ্যে রাত্রির আকাশে বিদ্যুৎ জ্বালিয়ে প্রচণ্ড শব্দে মাটিতে পড়লো প্লেনটা।

ভিড় ছুটলো আনারবাগের ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডটার দিকে। তখনও আগুনের শিখা দুলে দুলে উঠছে কালো আকাশের গায়ে। গুজব ফিরে এলো কিছুক্ষণের মধ্যেই।

কিন্তু, না, পরের দিন সকালেই খবর পাওয়া গেল। মারা যান নি রুমাবাঈ, বাঁচবেন কিনা তাও সন্দেহ। সমস্ত শরীর নাকি ঝলসে গেছে তাঁর। যদি বা প্রাণে বেঁচে যান তবু চিনতে পারবে না কেউ। হয়তো অন্ধ হয়ে যাবেন, হয়তো পঙ্গু হয়ে কাটাতে হবে সারা জীবন, আগুনে পোড়া কুৎসিত মাংসপিণ্ডের মতো।

আমরা সবাই, যারা এতদিন ঘৃণা করে এসেছি, দুর্নাম রটিয়েছি রুমাবাঈয়ের, কেমন যেন ব্যথা অনুভব করলাম।

আনারবাগ শহরের উজ্জ্বলতম তারা যেন হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে, যে তারার আলো আমাদের মনেও রোমাঞ্চ জাগাতো, যে তারার আলোয় ধাঁধা লাগতো আমাদের কল্পনাবিলাসী চোখে।

দিনকয়েক পরে বিজনকে কাছে ডেকে ফিস্‌ফিস্ করে প্রশ্ন করলাম, শুনেছিস ?

—শুনেছি।

বললাম, একবার দেখা করে আয় বিজন, মৃত্যুর আগে এইটুকু সান্ত্বনা তাকে দিয়ে আয়। এই দুর্ঘটনাই প্রমাণ করলো বিজন, রুমাবাঈ তোকে ভালবাসতো।

অবিশ্বাসের হাসি হাসলে ও। বলছো যখন যাবো। তুমি চলো।

প্যালেসের এক প্রান্তে সুব্যাপ্ত একটি ফুলের বাগানের মাঝখানে রাজা প্রতাপকিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের দানে গড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রুমাবাঈকে।

অনুমতি নিয়ে দেখা করতে গেলাম আমি আর বিজন।

একটি ফরসা ধবধবে রোগশয্যায় সাদা চাদরের মতো ম্লান হয়ে পড়েছিল রুমাবাঈয়ের অর্ধ-অচেতন শরীর। ওষুধের একটা তীব্র দুর্গন্ধ চারিদিকের হাওয়ায়। আর রুমাবাঈয়ের সারা শরীর ব্যাণ্ডেজে মোড়া। সমস্ত মুখ ব্যাণ্ডেজে ঢাকা।

ধীরে ধীরে টুলটায় বসলো বিজন। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে রুমাকে স্পর্শ করতে গিয়ে হাতটা ফিরিয়ে নিলো।

ডাকলে, রুমা।

ঠিক বোঝা গেল না, কি যেন অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে এলো রুমাবাঈয়ের মুখ থেকে। একটু বোধ হয় নড়লো ওর শরীরটা।

নার্স ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বিজনের নাম বললে।

রুমাবাঈ ফিস্‌ফিস্ করে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, ও আসে নি?

—কে? নার্স চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে।—কে, রুমাবাঈ?

—রায়, মিস্টার রায়। উত্তর এলো ধীর স্বরে।

—দেওয়ানজী? উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করে বসলাম।—খবর দেবো, ডেকে পাঠাবো রুমাবাঈ?

মরণোন্মুখ একটি নারীর যে-কোনো শেষ ইচ্ছাকে তৃপ্ত করলে যেন আমিও তখন তৃপ্ত হই।

দীর্ঘশ্বাসের মতো ব্যথার কণ্ঠে রুমাবাঈ বললেন, না, না, আমি জানি সে আসবে না।

—আসবে না? বিস্ময়ের স্বরে নার্স প্রতিপ্রশ্ন করলে।

হয়তো ব্যাণ্ডেজের বাঁধনে চাপা পড়ে গেল রুমাবাঈয়ের বিষন্ন ম্লান হাসি।—পাথর, পাথর সে, মানুষ নয়। এত ঈর্ষার

আগুন জ্বালাতে চেয়েছি বিজন, তবু চোখ ফেরায় নি সে। হেরে গেলাম আমি!

কোনো কথা বললাম না আমরা। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উঠে এলাম। আর রুমাবাঈয়ের সমস্ত দুর্নাম, সমস্ত হঠকারিতা আর দীপ্ত যৌবনের উদ্দামতায় ঢাকা পড়েছিল যে অতৃপ্ত ভালবাসা, যে ভালবাসা প্রকাশে ভীরু আর লজ্জায় দুর্বল, সেই ভালবাসার উজ্জ্বল শিখাটি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মন বললে, রুমাবাঈও ভালবাসতে জানে।

এতখানি দুর্বলতা কি করে ঢেকে রেখেছিল রুমাবাঈ, এতখানি অতৃপ্ত বাসনার গায়ে অপবাদের শাল জড়িয়ে রেখেছিল কেন!

বিজনকে সে-কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যে ফিরে তাকালাম হঠাৎ। দেখলাম বিজনের দু'চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে।

কান্না, কান্না। কিন্তু এ কান্নার খবর রাখলো না কেউ।

আনারবাগের দুর্নামী রটনা শুধুই মোতিকুমারীর বিয়ের সঙ্গে রুমাবাঈয়ের বিমান দুর্ঘটনার যোগাযোগ আবিষ্কার করে তৃপ্ত হলো।

কাঠের জাফরিটা চিকের পর্দা দিয়ে ঢাকা। দড়িটা ধরে টান দিলে চিকটা গুটিয়ে গুটিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। সকালে ওঠে. দুপুরে নামে। বিকেলে তোলা হয়, সন্ধ্যেবেলায় নামানো।

তখন সূয্যি উঠেছে। ভোর ভোর ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকে এ-সময়। সামনে টুকরো ছোট বাগানের খুচরো ফুলের স্নিগ্ধ-সুগন্ধে ঘর ভরে যায়। সারা বাগানে ফুল বলতে যদিও ওই একটি শিউলি ফুলের ঝাড়।

প্রাতঃস্নানে কাবেরীর নেশা। এই ভোর সকালে স্নান সেরে এসেছে ও। মুখের ওপর ভিজে গামছাটা আর একবার বুলিয়ে নিয়ে শাড়ি বদলাতে বদলাতে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। চটপট চুলটা আঁচড়ে নিলে, আঁচলটা গুছিয়ে।

ওঘর থেকে ডাক এলো।—আঁচটা ধরেছে কাবু?

—কোন সকালে। জল বসিয়ে দিয়েছি। পেয়ালা-পিরিচগুলো ঠিক করতে করতে কাবেরী উত্তর দিলে।

ওদিকে জাফরি ঢাকা চিকের পর্দাটা টেনে তুলে দিলেন রাজেনবাবু। জাফরির গায়ে গিঁট মেরে এঁটে দিলেন দড়িটা। তারপর কপাট খুলে বাইরের বাগানের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। দূরের রেললাইনটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। জরিপাড় জামদানির মতো সমান্তরাল একজোড়া রেখা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঁক ঘুরেছে। মোড়ের মাথায় লম্বা-হাত সঙ্কেত। সিগন্যালের পাখনাটা

ঝুলে পড়েছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা আসবার সময় হয়ে গেছে বোধ হয়।

রাজেনবাবু বাইরে থেকেই হাঁক দিলেন কাবেরীকে।—ছোটো কুঠুরির তাকে দাঁতনের কাঠি আছে, দিয়ে যা তো কাবু।

—যাই বাবা। কাবেরী উত্তর দিলে ভিতর থেকেই।

হাল্কা বাতাসে জানালার পর্দাটা উড়ছে পৎপৎ করে।

বাইক চালিয়ে লাল কাঁকরের সড়ক মাড়িয়ে কে যেন আসছে। মাথায় ঝুঁটি-ঝোলানো লাল টুপি।

—আজ কি বেরুবে নাকি?

স্ত্রীর কথায় ফিরে তাকালেন রাজেনবাবু। তার হাত থেকে নিলেন দাঁতন কাঠিটা। তারপর বললেন, আমি একদিন না বেরুলেও খেতে পাবো, কিন্তু রুগীদের কি হাল হবে?

চায়ের পেয়ালা হাতে কাবেরী এসে হাজির হলো।—চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!

—ও, আচ্ছা দে চা-টা, খেয়েই নিই।

কোন এক পুরোনো দিনের জের টেনে ব্যঙ্গের স্বরে কাবেরীর মা বললেন, সেই ভালো দাঁত পরে মাজলেও চলবে।

চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে আনমনা চুমুক দিলেন রাজেনবাবু, স্ত্রীর ব্যঙ্গোক্তি কানে গেলো না। মনে মনে তখন হয়তো রুগীদের তালিকা তৈরী করছেন। কোত্থেকে কোথায়, কার বাড়ি থেকে কার বাড়ি।

আরগাডা কোলিয়ারীর ডাক্তার রাজেন বসু।

হাতযশ যথেষ্ট। যুদ্ধের বাজারে যখন কোথাও এতোটুকু সত্যিকারের ওষুধ মিলতো না, রুগীরা যখন জেনেশুনেই নিয়ে যেতো শুদ্ধি-জল আর চিরেতার গুঁড়ো মেশানো ময়দা, তখনও রুগীরা ওঁর বিদ্যেকে বাহবা দিয়েছে।

ওঁর ওপর অটল বিশ্বাস সাঁওতাল কুলিকামিনদের।

তারা বলতো, তুঁই বাবু গুণ করতে জানিস, উদেঁর মতন খুন করিস্ না তুঁই।

—হয়েছে হয়েছে! টাকাটা দে দিকি নি। আর ওষুধের দাম সাড়ে ছ'আনা। রাজেনবাবু একটু রূঢ় হবার চেষ্টা করেই বলতেন।

শুধু আধাবুনো মেয়ে-মরদরাই নয়, য়্যাংলো মেয়ে আর বাঙালীবাবুদের মধ্যেও ওঁর প্রশংসা ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে নি।

হাবেভাবে দেখাতে চান, উনি শুধু টাকাই চান, গুণগান নয়। কিন্তু টাকার চেয়ে সুনামটাই তাঁর কাছে বড়ো। সুনাম পেয়েছেনও সবার কাছে, এক অমিতাভ ছাড়া আর সকলের কাছেই।

কাবেরীর মামা অমিতাভ, অর্থাৎ রাজেনবাবুর শ্যালক। থাকে কাছাকাছি, কাছের স্টেশন বরকাকানার এ-এস্-এম্ সে। চেনাজানা কারও জীপ একখানা হয়তো আসছে এদিকে, অমিতাভ চড়ে বসলো। হপ্তায় এমন দু' একদিন আসবেই সে, দিদির খোঁজখবর নিতে।

খোঁজখবর নিতে, না ঝগড়া করতে।

অপরে যেটুকু বা গুণগান করে, উপেক্ষা করে যায় অমিতাভ। বলে ভগ্নীপতি হিসেবে ইউ আর এ ফাইন ম্যান, তা বলতেই হবে। কারণ, বাবার বুদ্ধি কম ছিলো এ-কথা তো বলতে পারি নে। তবে, ডাক্তার হিসেবে,···ফুঃ।

রাজেনবাবু বলেন, ইংরেজিতে বলে বাটলারের কাছে হিরো হওয়া যায় না। তা 'শালা' কথাটারই ইংরেজি হলো বাটলার।

নিরুৎসাহের হাসি হাসে শাঁওন। বলে, শালা ডরপুকের দল, দাগী আসামীর নাম শুনলে ভয় পায়।

—তবু একটু তদ্বির ক'রেই দেখো না একবার।

—তগদীর থাকলে তদ্বির লাগে না লখিয়া। উত্তর দেয় শাঁওন।

লখিয়া চটে যায়।—তগ্‌দীর আর তগ্‌দীর! ভগবান কি তোমায় ছপ্পর ফেড়ে দৌলত দিয়ে যাবে নাকি?

শাঁওন উত্তর দেয় না। হাসে। আর তাকিয়ে থাকে ওর কুঠির সামনে দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে যে সর্পিল মেঠো রাস্তার রেখাটি, তার দিকে। কাঁধে লাঠি উঁচিয়ে, লাঠির ডগায় সংসার বেঁধে ক্যাঙারুর মতো কুঁজিয়ে কুঁজিয়ে ছুটে চলেছে সকলে। রূপঝিলের দিকে, রূপঝিল ছাড়িয়ে বুনো পাহাড়ে বাঁকা রাস্তা ধরে শাল-শিমুলের বনের পথে।

নীচের উপত্যকা নীচে ফেলে রেখে, পাহাড়ের ওপরে, আরো ওপরে উঠলে মিলবে কুলিকামিনদের কণ্ঠকাকলী। নীল গাইয়ের খুরের শব্দ আর চিতাবাঘের চিৎকার থেমে গেছে সেখানে। মধুলোভী ভালুকের দল হয়তো অভিমানী জড়বৃদ্ধের মতো কুঁজো হয়ে দূরে সরে চলেছে ভীতত্রস্ত দু'পায়ে ভর দিয়ে। ঘাসে মুখ লুকিয়েছে খরগোশের সারি, ঝোপের আনাচে তিতির আর বুনো-হাঁস। কাক চিল শালিকের পাখা ঝটপটানি থমকে দিয়েছে হাজারো রোজমজুরের দল।

জঙ্গল সাফ করতে নয়, গাছ কাটতে এসেছে ওরা। কাঠ কাটতে।

মাঝাং পাহাড়ের জঙ্গল ইজারা নিয়েছে এবার ব্রিজলাল। আরগাডার কয়লাখনিতে কুলি জুগিয়ে এসেছে যে এতোদিন, আজ তার কুঠির ফটকে পড়েছে কাঠের ফলক। গোটা গোটা হরফে রং

লেখা নামটার নীচে স্পষ্টাক্ষরে খোদাই করা দুটো ছোট্ট কথা : টিম্বার মার্চেণ্ট।

তিন হাজার টাকা সেলামী আর বছরে বারো হাজার টাকা বনকরের বিনিময়ে পেয়েছে সে মাঝাং পাহাড়ের ইজারা। শাল আর শিশু, আমলকী আর মহুয়া গাছের ভিড় বনে বনান্তরে। সেদিকে চোখ রেখে লক্ষ টাকা মুনাফার স্বপ্ন দেখেছে সে। বেওয়ারিশ বনস্পতির গায়ে এঁকেছে আপন শর্ত, পেয়েছে রত্নগুহার সন্ধান।

শুধু ব্রিজলাল নয়, আরো অনেকে। দৃষ্টির দিগন্তে তারা দেখতে পেয়েছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাদের বহুবর্ণী রঙবীন চোখে।

ডেরাতে ডিহিতে খবর পাঠিয়েছে ব্রিজলাল। ডুগডুগি বাজিয়ে জানিয়ে দিয়েছে ওঁরাও আর মুণ্ডাদের আড্ডায়।

কুলি চাই। জঙ্গলের গাছ কাটতে, চেরাইয়ের কাজ করতে। আর ভার বইতে। কাটা গাছের গুঁড়ি বয়ে নিয়ে এসে ছেড়ে দিতে হবে রূপঝিলের জলে। মহুয়ামিলনের পোলের নীচে বাঁধা আছে তারের জাল। কুমীরের মতো পিঠ ভাসিয়ে নেমে আসবে কাঠের স্তূপ। সেখান থেকে লরীতে বোঝাই হয়ে আসবে লাতে-হারের সাইডিংয়ে। তারপর, কোলকাতা করাচী, মাদ্রাজে মালাবারে।

কুলি চাই। চাই জনমজুর।

দিনে বারো আনা মজুরী আর আধ সের চাল নয়তো গম। বছরে এক জোড়া কাপড়, একখানা দোসুতি-গামছা। মেয়েরা পাবে আট আনা।

মরা গাঙে জোয়ার ডাকলো যেন। দেহাতীদের মনেও। কাজের মতো কাজ জুটেছে। এবার আর যেতে হবে না দূরের কোলিয়ারীতে। কেঁচোর মতো মুখ গুঁজতে হবে না কাদায় আর অলো মাটিতে। নামতে হবে না পাতালের গহ্বরে।

সুস্থ সুখোজ্জ্বল চোখে ছুটে চলে ওরা। এক দলের পর আরেক দল। ম্যানেজারের তাঁবুর দিকে। পুরুষ আর মেয়ে, বাচ্চা আর বুড়ো।

শাঁওনের কিন্তু সেই এক কথা। নিজে নড়ে চড়ে বসবে না, কোসিস করবে না, কসুর অন্যের। খুনীর খুন যার শিরায় সে যাবে ওই বাঙালীবাবুর খোশামোদ করতে। দুবলা আওরাতের মতো খুশামদ ওর ধাতে নেই।

—দুবলা আওরাত। লাখিয়ার হাতের চাপে একটা তাজা ডিম ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। বলে, যেতে হবে না তোমাকে, রোজের কাজ নেবো আমি, হাত দুটো তো এখনো ভগবান ছিনিয়ে নেয় নি।

বাধ্য হয়েই যেতে হয় শাঁওনকে। হাজির হতে হয় ম্যানেজারের তাবুতে। কাঁধের টাঙিটা টেবিলের ওপর দুম্ করে ফেলে দিয়ে ঝাঁকড়া চুলের ফাঁকে লাল চিরুনিটা শক্ত করে বসাতে বসাতে বলে, নোকরি চাই মানজারবাবু।

হাতের কলমটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরালে অনুপম। তারপর শাঁওনের দিকে তাকিয়ে বললে, ক'খানা গাছ কাটতে পারিস দিনে? কাঠ কাটতে পারবি, মাটি কোপাতে?

—ছোঃ। কি যে বলিস মানজারবাবু। ও কাজ করবে ওই ওঁরাও আর মুণ্ডারা। আমি সান্তাল নই, জংলী নই। ছত্তিশগড়ের রাউত আমি।

অনুপম হেসে বলে, তা হলে কাজটা কি করবি? গাছ কাটতে পারবি না, মাটি কোপাতে পারবি না।

শাঁওন বললে, কত আদমীর জান নিয়ে এলাম, গর্দান কুপিয়ে নিয়ে এলাম আমি, আমাকে বলিস মাটি কোপাতে? আমার নাম শাঁওন গাঙাট।

—ও, তুই বুঝি সেই গুণ্ডা সর্দার? কয়েদ থেকে ছাড়ান পেলি কবে?

শাঁওন হেসে ওঠে। বীভৎস হাসি।

বলে, শালার লাস তো গুম্ করে দিয়েছিলাম। তখন শালা লাস পাগড়ি বললে, চোর, দারু চুরি করেছিস ধনীরামের ভাঁটি থেকে।

অনুপম বললো, চৌকিদারের কাজ করবি?

—চৌকিদার?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, জঙ্গলের পাহারাদার।

—চোরকে চৌকিদার? হো হো করে হেসে ওঠে শাঁওন, বলে, লিখে নে তুই মানজারবাবু, করবো কাজ।

শাঁওনকে বিদায় দিয়ে ছুট পায় অনুপম। হাত পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করে। কাজ শেষ হয়েছে, আরগাডায় ফিরতে পাবে সে আজ। হু'টো দিনের কর্মক্লান্ত অবসাদে শরীর আর মন বিষিয়ে আছে। টেবিলটার ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে নিশ্চুপ পড়ে থাকে কিছুক্ষণ। মনে মনে সুখস্মৃতির টুকরো নাড়াচাড়া করে বারবার। কাবেরী বোধ হয় পরপর দু'দিন ব্যর্থ আশা নিয়ে দাঁড়িয়েছে বাড়ির বাঁকে। অপেক্ষা করেছে। কাবেরী, কাবেরী। চমৎকার মিঠে নাম, কী যেন এক অজ্ঞাত মোহ আছে নামটার মধ্যে। ব্রিজলালের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে হঠাৎ। এতো তাড়াহুড়ো না করে, একটু সময় থাকতে বলে না কেন লোকটা। কাবেরীকে একটা খবর দিয়ে আসতে পারতো তা হলে।

কাবেরী আজও ছুটে এসেছিলো। ভোরের ভোঁ বাজার সঙ্গে এই সময়টাতেই যে অনুপম যায় তার আরগাডার আপিসে।

কোলিয়ারী আপিসের গায়ে ব্রিজলালের গদি। সেখানে। তাই প্রতিদিন এ সময়টায় ঘন ঘন ছুটে আসে কাবেরী। দেখতে আর দেখা দিতে। ফুরসত পেলে দু'চারটে কথাও বলে নেয়।

শিবলিঙ্গের মতো গোল আর মসৃণ একটা একক পাহাড়। তারই পাশ দিয়ে ওঠে সকালের সূর্য। রাঁচী হাজারীবাগ, লাপ্‌রা আরগাডার সেই বিরল সূর্যসৌরভ দেখা দেয়। আর লাল মাটির প্রান্তর—পায়ের তলা থেকে পিছলে গিয়ে মেশে মেঘের চিবুকে। লম্বা মাঠ, গেরুয়া মাটির মাঠ। আর মাঝে মাঝে শস্যশ্যামল সবুজের দ্বীপ। ভুট্টার ক্ষেতে ভুখা বাচ্চার কান্না। নয়নারাম সবুজের স্বপ্নে ঘেরা মাঠ, আর তারও ওপারে বনশ্যামলী। মাদার আর মহুয়ার গাছ। শাখার ফাঁকে সূর্যশল্ল। ওপরে আকাশ মখমল। সাটিনের চাঁদোয়ায় রক্তবর্ণে এক লালের রেকাবি।

এতো যে চিত্তচমৎকারী পৃথিবীর রূপ তা দেখবার সুযোগ মেলে না কাবেরীর বরাতে। যতো কাজ তার এই সময়টিতে। এক টুকরো অবসর, এতোটুকু অবকাশ যদি মেলে তো কাবেরী ছুটে আসে খিড়কির উঠানে। রূপ দেখতে। পৃথিবীর? কে জানে, হয়তো বা রূপ দেখাতে।

অনুপমের দেখা মিলছে না কেন? কাবেরী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় সদর দরজার দিকে গিয়ে দাঁড়াতে। হয়তো কাবেরীর চোখ এড়িয়ে অনুপম কোন ফাঁকে পার হয়ে যাবে খিড়কির দিকের মোড়টা। সদরে দাঁড়ালে তবু অনেকখানি পথ চোখে পড়ে, এতো অল্প সময়ের মধ্যে উধাও হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু সদর আগলে বসে আছেন কাবেরীর বাবা।

চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এ সময়ে এসে বসবেন তিনি বাগানে। হ্যাঁ, প্রতিদিন। বাঁশের বাতা দিয়ে ঘিরে ছোট্ট এক টুকরো বাগিচা রচনা করেছেন রাজেন ডাক্তার। মধুমল্লিকা বা

রজনীগন্ধার রসমাধুর্য উগভোগ করার জন্যে এ বাগানের উৎপত্তি নয়। হ্যাঁ, কোণের দিকে একটা শিউলি গাছ আছে বটে। তবু কুমড়ো, ঢ্যাঁরস, বেগুন আর টমাটোর চাষ করেছেন রাজেনবাবু এই ছোট্ট বাগানে। ফুলকপির চারা লাগিয়ে দেখেছেন, পোকায় খেয়ে দেয়।

রাজেনবাবুর চোখে মাধবীমালঞ্চের চেয়ে বার্তাকু উপবনটা আরও বেশী মোহনীয়। তাই প্রতিদিন ভোর সকালে দাঁতে নিমকাঠি ঘষতে ঘষতে এসে বসেন তিনি এখানে। বাগানের মাঝখানটায় একখানা ভাঙা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে।

পাহাড়ের পাশে রেল লাইনের শেষ দিগন্তে যেখানে ইস্পাতের চক্‌চকে লাইন দু'খানা গিয়ে মিশেছে একটি বিন্দুতে, যেখানে উড়ছে মেটে পাখনা শঙ্খচিলের সারি, যার ওপাশে উঠছে লাল—না, এতক্ষণে পীতাভ হয়ে এসেছে সূর্য, ছোট হয়ে এসেছে—সেদিকে তাকিয়ে ঠাওর করতে পারলেন না রাজেনবাবু, ডিসট্যান্ট সিগন্যালটা নেমে পড়েছে কি না। হঠাৎ রোদে চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

কেদারাটা টেনে বসতে যাচ্ছিলেন, ডাক শুনে চমকে ফিরে তাকালেন।—কে ইদ্রিস? কী খবর?

কালো ঝুঁটি ঝোলানো লাল টুপিটা একহাতে ধরে বাইকটা বেড়ার গায়ে রেখে খামে মোড়া চিঠিটা দিল ইদ্রিস।

চিঠিটা পড়ে বললেন, আচ্ছা। যাবো একটু পরে।

ইদ্রিস চলে গেল।

কাচা কাপড়টা তারে মেলে দিতে দিতে কাবেরীর মা বললেন, চেয়ারের হাতলে একটা শাড়ির পাড় ছেঁড়া বাঁধা রয়েছে দেখতে পেয়েছো?

—হ্যাঁ, এখানটা ভেঙে গেছে বলে বেঁধে রেখেছি।

—বেশ করেছো, ওটা ফেলে দিয়ে এসো।

—কেন ?

—ওকে ছুঁয়ে চিঠি নিলে না ?

আর কথা বাড়াবার সাহস হলো না রাজেনবাবুর। পাড়টা খুলে ফেন্‌সিংয়ের ওদিকে ফেলে দিয়ে এসে বসলেন।

—মঞ্জুর সঙ্গে একবার দেখা করে অসেতে হবে, মনে আছে তো ?

—সময় পাই তো যাবো।

—সময় পাই তো মানে ? কতোটুকু সময় লাগবে দেখা করে আসতে ? সংসারের এটুকু কাজও হবে না তোমাকে দিয়ে ?

—সংসারের কাজ না হাতি। কে না কে, মামার মেসোর ভাইঝি—

কথাটা শুনে চটে গেলেন কাবেরীর মা। দুম্‌দুম্‌ করে পা ফেলে ভেতরে চলে গেলেন। মনে মনে হাসলেন রাজেনবাবু। আরেকদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন চন্দ্রনলিনী নাম না রেখে তোমার নাম রাখা উচিত ছিল অসুরদলনী। আজ আর সে বিদ্রূপের পুনরুক্তি করতে সাহস পেলেন না।

সময় হয়ে আসছে এদিকে। ওঠবার ইচ্ছেও রয়েছে। কিন্তু আবার চোখা-চোখি হতে পারে স্ত্রীর সঙ্গে। তাই বসে রইলেন রাজেনবাবু।

কাবেরীর ডাক এলো একটু পরেই :—বাবা, চান করে নাও।

সাড়া দিলেন না রাজেনবাবু, শুধু গামছাটা কাঁধে ফেলে কলঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

—জলখাবার হয়েছে ? স্নান করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন কাবেরীকে।

—হয়ে এলো বলে। তুমি চানটা সেরে আসতে আসতে হয়ে যাবে। কাবেরী উত্তর দিলে।

মাথায় গামছা ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে এলেন রাজেনবাবু।

—শিবুটা গেল কোথায়, পড়তে বসে নি এখনো।

কাবেরী উত্তর দিলো, ওঝা বাবুদের বাড়িতে গেছে, চিনি চেয়ে আনতে। দেখি এলো কিনা।

ফুটন্ত সুজিতে খুন্তিটা ত্বার নেড়ে দিয়ে বাইরে এলো কাবেরী, শিবুর খোঁজে। এমনি একটা ফিকির খুঁজছে ও। ত্ব'মিনিট অন্তর একবার করে উঁকি মেরে দেখে যাবে, অনুপম এলো কিনা?

ফিরে আসতেই অনুযোগ শুনলে কাবেরী।—চিনি ফুরিয়ে গেছে বলিস নি কেন?

মুখ চোখ ঘুরিয়ে কাবেরী বললে, বা-রে। কাল থেকে মা বলছে তো। তোমার কিছু মনে থাকে না বাবা।

—ও। তা সুখলালকে একবার পাঠিয়ে দিলেই তো পারিস, বরকাকানায় তোর মামার কাছে।

—আজ পাঠাবো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিস। বস্তা ফুটো করে ত্বচার সের চিনিই যদি না যোগাড় করতে পারলো তা হলে আর এ-এস্-এম্ কিসের! মুচকি হেসে রাজেনবাবু বললেন।

কথাটা কাকে খোঁচা দেবার জন্যে বললেন, নিজেই হয়তো বুঝলেন না। অনুপস্থিত অমিতাভের উদ্দেশে, না স্ত্রীকে চটাবার জন্যে?

ওদিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি হানলেন কাবেরীর মা। আড়চোখে মা'র মুখের দিকে একবার, বাবার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে কাবেরী না হেসে পারলো না।

শিবু ইতিমধ্যে সিগারেটের টিনে এক কৌটো ধার করে আনা চিনি হাতে এসে হাজির হয়েছে। তার হাত থেকে কৌটোটা নিয়ে কাবেরী মা'র উদ্দেশে বললে, মামা তো নিজেই বলে গেলো সেদিন, তবে আবার চটছো কেন ?

—চুরি করে, বলেছে তোকে ?

—বাবাও তো যোগাড় করার কথা বললো, চুরি বলে নি।

জলখাবারের ব্যবস্থা করে দিয়ে সবে খিড়কির চৌকাঠ ডিঙিয়েছে কাবেরী, অমনি বাধা পড়লো।

—আবার চললি কোথায় ? হুট্ হাট করে কেবল বাইরে বেরুস কেন ঘর থেকে ?

কাবেরী অভিমান করে ফিরে এলো।—বেশ, যাবো না তবে। দীনভজনটা পালাক এই ফাঁকে, আমার কি।

—ও। তা যা, সত্যিই পালাবে হয়তো।

—পারবো না আমি, তুমি যাও না।

—মেয়ের আবার অভিমান হলো। বলে গেলেই তো পারিস। মৃদু হেসে মেয়ের অভিমান ভাঙাবার চেষ্টা করেন কাবেরীর মা।—তোর ভালোর জন্যেই বলি মা, বিদেশ বিভুঁই জায়গা, হাজার রকমের সব লোক—

রাজেনবাবু বললেন, কুটোটি কেটে তো দুটো করতে পারবে না, মেয়েটা খেটে খেটে হয়রান হয়ে গেলো, তার সঙ্গে একটু ভালো ভাবে কথা বলবে, তা নয় দিনরাত খিটিমিটি।

উত্তর আসে।—বকিয়ো না মেলা। অমন বয়সে আমি বারোটা মুনিষের ভাত রেঁধেছি। শাশুড়ি ননদের খোঁটা খেয়েছি দিনরাত।

—তাই শোধ নিচ্ছো মেয়ের ওপর ?

—কী বললে, শোধ নিচ্ছি ? পেটের মেয়ের ওপর শোধ নিচ্ছি আমি ?

—তাইতো দেখছি। অথচ মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভেবে ভেবে তো রাতে ঘুমুতে দাও না।

—তবে? কেন ভাবি, কেন? মেয়ের ভালোর জন্যে নয়?

রাজেনবাবু এতোক্ষণে বুঝলেন গলাটা তাঁর একটু চড়া হয়ে গিয়েছিলো। মুখে তাই হাসি টেনে আনার চেষ্টা করে বললেন, সেই কথাই তো বলছি। কাবেরীর জন্যে তুমি যা ভাবো, ওকে তুমি যতোখানি ভালোবাসো তার এক আনাও আমি হয়তো পারি না। তবু কেন যে মেয়েটাকে খোঁটা দাও।

—শাসন না করলে 'মানুষ' করা যায় না, তা তুমি কী করে জানবে। সে চোখই কি আছে তোমার!

রাজেনবাবু উত্তর দেন, শাসন করবে বইকি, তা বলছি না। মানে এই তেপান্তরে এসে পড়ে রয়েছে বেচারী, একটা বন্ধু নেই বান্ধব নেই, ইস্কুলের মুখ দেখতে পেলো না—

কাবেরীর মা'র মনও নরম হয়ে আসে, ভিজে গলায় বলেন, সত্যি, একটা পিঠোপিঠি বোন থাকলেও মন খুলে কথা বলবার লোক পেতো!

বাবা মা তর্ক করুক না, কাবেরী এদিকে অনেকক্ষণ আগেই খিড়কির দোর পেরিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। ও বোঝে, অভিমান করে ক্ষতি ওরই হবে। এই ফাঁকে হয়তো—দীনভঞ্জন নয়—অনুপম পালাবে সুরুৎ করে।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে, বিস্তৃত প্রাঙ্গণের প্রান্তে এসে দাঁড়ালো কাবেরী। রোজই তো অনুপম যায় এ পথ দিয়ে। অন্যদিনের একটা কথা মনে পড়লো। মনে পড়ে কৌতুক বোধ করলে কাবেরী। দূরের কালভার্টটা অবধি গম্ভীর মুখে হেঁটে যায় অনুপম, যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে গেলো এমনি চিন্তার রেখা ফোটে তার কপালে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই যেন। তারপর দক্ষিণের তেমাথার বাঁক

ফেরবার সময় চট্‌ করে একবার পিছন ফিরে তাকায়। হঠাৎ কোনো ডাক শুনে বা শব্দ শুনে আচমকা যে ভাবে মানুষ ফিরে তাকায় সেইভাবে। ঠিক এই মুহূর্তটিতে কাবেরীর চোখ থেকে অনুপমের চোখ অবধি একজোড়া অদ্ভুত রহস্যময় সমান্তরাল রেখা টানা হয়ে যায়। পরস্পর পরস্পরের কাছে হয়ে ওঠে অত্যন্ত নিকট। কাবেরীর চোখে অনুরাগ উছলে ওঠে। তারপর, তারপরই অনুপমকে আর দেখা যায় না। ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের কুঠিটায় আড়াল পড়ে সে। আর কুয়াশার মতো এক ক্লান্তির গভীরতা নামে কাবেরীর বুকে।

স্তব্ধ সমুদ্রের ছায়া পড়ে কাবেরীর মনে। দূরের সমুদ্রে নীলাভ দ্বীপের মতো ঝাপসা হয়ে আসে তার স্বপ্নসজল দৃষ্টি। প্রভাতী পুজোর ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে। কিন্তু আজও অনুপমের দেখা নেই।

হপ্তায় একটা দিন ওই কাছের শিবমন্দিরে দেখা হয় দু'জনের, সারা সপ্তাহের আশা আকঙ্ক্ষায় বাঁধা প্রতীক্ষার প্রহর আসবে আগামী কাল। চোখের পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতর করে তোলে ক্ষণবিশ্রম্ভের আলাপ। কিন্তু, আজও দেখা নেই অনুপমের। ব্যথাতুর চিন্তায় সব ভুলে গিয়েছিলো কাবেরী। হঠাৎ টিন পেটানোর আওয়াজ শুনে চমকে ফিরে তাকালো।

দীনভজন চলেছে সরকারী কুয়োর দিকে। ঘাড়ে বাঁক, দু'পাশে দুলছে দু'টো ফাঁকা টিন—কেরোসিনের। হাতের কাঠিটায় টিনটা বাজাতে বাজাতে চলেছে।

কাবেরী ডাক দেয়।—দীনভজন, দু'ভার জল দিয়ে যাও আগে।

—মাস্টারবাবুর বাড়ি হয়ে গেলেই দিয়ে যাবো, মাঈজী।

—না না, আগে দিয়ে যাও। আসতে অনেক দেরি হবে তোমার, কাজ পড়ে থাকে তোমার জন্যে।

—আচ্ছা, মাঈজী। এক ভার পানি আগেই দিয়ে যাবো।

দীনভজন চলে যায় কুয়োর দিকে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কাবেরী ফিরে আসে। বলে, দীনভজনটা কি বলো তো মা ? এতো মানা করি তবু মাঈজী আর মাঈজী। দিদি বললেই তো পারে।

স্নেহাতুর চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হাসেন কাবেরীর মা। দূর ভবিষ্যতের কোন এক সানাই রাগিণীর সুর ভেসে আসে যেন। স্বপ্নসায়রে যেন দীনভজনের সম্বোধনটুকু সার্থকতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উদাস হয়ে ওঠে মন। দৃষ্টিহীন চোখ অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে যায়। সামনের পাহাড় ডিঙিয়ে, দূরের দিকচক্রবাল ভেদ করে। আনন্দে উত্তেজনায় চোখের কোণ বেয়ে জল গাড়িয়ে পড়ে। সত্যি, কাবেরী বড় ভালো মেয়ে।

দূরের সীমান্ত থেকে চোখ ফিরে এলো, আঁচলে চোখের জল মুছতে গিয়ে আনন্দের হাসিতে ভরে উঠলো সারা মুখ। বারান্দায় বেরিয়ে এলেন ঘরের জানালা ছেড়ে। উনুনের গরমে কাবেরীর মুখ লাল হয়ে উঠেছে, ঘাম ঝরছে কপাল থেকে। তবু একমনে রান্না করছে বসে বসে। সমস্ত বুক ভরে কাবেরীকে দেখলেন, যেন বুকের মধ্যে কাবেরীর শরীরটা টেনে নিলেন কল্পনার আলিঙ্গনে, স্নেহে, প্রীতিতে, আশিস-আশ্লেষে। সুন্দর, অদ্ভুত সুন্দর মনে হলো। দেহের প্রতিটি শিরায় যেন স্বাস্থ্যের জোয়ার এসেছে।

না, আর দেরি করা উচিত হচ্ছে না। এ বয়সটাকে, এই রূপের প্রাচুর্যকে ভয় করতে হয়। আর, আর এই নোংরা কৌরব রাজত্বকে আরো বেশি ভয়।

ছত্রিশটা জাতের মানুষ দিনরাত চলাফেরা করছে বাড়ির আনাচে কানাচে। সুতো কাটা ঘুড়ির মতো বেপরোয়া উড়ে উড়ে বেড়ায় ছেলেগুলো, কেউ শিস দেয়, কেউ বা চিৎকার করে কানে-আঙুল-দেওয়া কথা বলে। ভদ্রলোক তো নয় যে সম্মান অসম্মানের কথা

ভাববে। বাপ মা'গুলোও যেমন সব ছন্নছাড়া! কেউ বেজাতে বিয়ে করেছে, কেউ বা বিয়ে করেছে কিনা তাই সন্দেহ। ছেলেগুলো দেখে শিখছে, ভালো হবে কোত্থেকে।

আর, ওদেরই বা দোষ কি। কুলিমজুর থেকে কেরানী বাবুরাও তো নকল করছে ওই সাহেবসুবোদের।

ছি ছি ছি! মনে পড়তেও ঘেন্নায় মন বিষিয়ে যায়। প্রথম প্রথম ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাহেবপাড়া দিয়ে বেড়াতে যেতেন, কিন্তু ওই একটা দিনের পরই ওদিকে বেড়ানো বন্ধ করে দিয়েছেন। ভাগ্যিস ছেলেমেয়েদের চোখে পড়ে নি! হায়ালজ্জা বলে কি নেই কিছু ওদের?

না, দেশে হলে কাবেরীর বিয়ে দু'বছর পিছিয়ে গেলেও ভয় পেতেন না, ভাবনা হতো না। এখানে এই পাপের রাজত্বে কোন ভরসায় থাকবেন

কিন্তু দলবল নিয়ে তারা যে মেয়ে দেখে গেলো, কই তাদের চিঠিও তো এলো না এখনো।

এক হয়ে মিশে গেছে সকলে।

যন্ত্রের যন্ত্রণা। অক্টোপাসের অজস্রবাহুর বন্ধন যেন এক গোষ্ঠীতে বেঁধে ফেলেছে সকলকে। দেহাতী ওঁরাও, ছত্রিশগড়ের রেজা-রোজমজুর। ব্যাঙ্গালোরের য়্যাংলো আর কাথিয়াবাড়ের সওদাগর। অন্ধ্রবাসী করণিক আর আলিগড়ের খালাসী। সব জাতের আর সব ধাতের মানুষ এসে মিলেছে এখানে। মিশে গেছে।

সাহেবপাড়াটা একটু তফাত হয়ে চলে, একটু কাঁধ বাঁচিয়ে। কৌলিন্য বজায় রেখে। শুধু দু'চার মুহূর্তের জন্যে এক স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়।

হ্যাঁ। ব্রিজলাল আসতে পেয়েছে আজকের মজলিসে। আর অনুপমও। তার কারণ, এ জলসার খরচ এসেছে ব্রিজলালের সিন্দুক থেকে।

ছোটো সাহেব স্যামুয়েল বলেছিলো, শুধু ডালি পাঠালেই কাজ হয় না ব্রিজলাল। তোমার সে আগেকার ম্যানেজার যে এখন ব্যাগ আর ব্যাগেজ নিয়ে এডেন পেরিয়ে গেছে। নতুন ম্যানেজার বড়ো কড়া লোক, ইন্‌জাসটিস দেখতে পারে না।

ব্রিজলাল হেসে বলেছিলো, কোসিস্ করলে সাব তুমিই করে দিতে পারো।

—ব্রিজলাল, দ্যাট ওয়াজ এ রেজিং কন্‌ট্রাক্‌ট য়্যাণ্ড দিস ইজ—

—টিম্বার সাপ্লাই। অনুপম পূরণ করে দেয়।

শেষকালে নাছোড়বান্দা ব্রিজলালকে উপদেশ দিয়েছিলো স্যামুয়েল, একটা ভালো রকমের পার্টি দিতে। হাগিন্স যাতে বোঝে যে, ব্রিজলাল একজন সলিড বিজনেসম্যান। তারপর আঙুর আপেল আখরোটের তলায় আধ ডজন হোয়াইট হর্স নয়তো ব্ল্যাক লেবেল আর তার তলায় পার্চমেণ্টে ছাপা হিজ ম্যাজেস্টির ছবি দেখলে—

কথা শেষ করে নি স্যামুয়েল। ওর অর্থপূর্ণ হাসিই বক্তব্য ফুটিয়ে তুলেছিলো।

তাই। আজকের এই পার্টিতে আসার ছাড়পত্র পেয়েছে ব্রিজলাল। আর অনুপম।

কোলিয়ারীর ইনস্টিটিউট-হল আজ আলোয় ঝলমল করে উঠেছে।

রঙ আর রূপের আতিশয্য, আলো আর উন্মাদনা।

—জুডি গার্দাও একজন রিয়াল লেডী হয়ে উঠেছে।

—আমাদের ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ক্লাব হকিতে হেরে গেল রেলওয়ের

—ম্যাক্‌টা দিনকে দিন বড়ো ইউকজোরিয়াস হয়ে উঠেছে কেন?

ইনস্টিটিউট বিল্‌ডিঙের সামনে বিস্তৃত ঘাসের লন। ওপর থেকে দেখলে চক্রগোল উদ্যানটিকে দেখায় যেন স্টিয়ারিঙের মতো।

হাগিন্স বসে আছে নিশ্চুপ। আর, ওর স্থিরনিবদ্ধ চোখ পড়েছে ফার এণ্ডের ঘাসের পাখার আড়ালে আর একজোড়া কৌতুকী চোখের ওপর।

ব্রিজলাল আর অনুপম চরকির মতো ঘুরছে। তত্ত্বাবধানের ভার যে ওদেরই ওপর। শুধু মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছে বিনয়াবনত মস্তকে, হাগিন্সের পিছনে। স্যামুয়েলের ইশারায় কাজ করে চলেছে।

নেশার ঘোর হাগিন্সের চোখে। উঠে দাঁড়াল ও। ধীরে ধীরে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। গোল থামটার পাশে।

একে একে আলো নিভে আসছে। যেন বাসরযামিনী মিইয়ে এলো ক্রমশ। আলোর আনন্দ, হাসির হঠকারিতা, রঙের রঞ্জনী নিস্তব্ধ হয়ে এলো।

সবুজ ঘাসের লনে পায়চারি করছে হাগিন্স আর স্যামুয়েল। পিছনে পিছনে ছায়ার মতো এঁটে আছে ব্রিজলাল।

স্যামুয়েল বললে, ব্রিজলাল ওর ফরেস্টে যেতে ইনভাইট করছে একদিন।

—ফরেস্ট? হাসলে হাগিন্স। কি আছে সেখানে? ওক্‌স য়্যাণ্ড পাইন্‌স, বার্ডস য়্যাণ্ড বীস্টস? আমি পোয়েট নই, মিস্টার স্যামুয়েল।

স্যামুয়েল বললে, হান্টিঙে তো যেতে পারেন।

—ইয়েস। হান্টিং—চমৎকার। আই উড র‍্যাদার।

—চলুন না একদিন ফরেস্টে, সবকিছু ব্রিজলাল য়্যারেঞ্জ করে দেবে।

হাগিন্স চমকে চোখ তুললে।—কী আছে সেখানে, কী পাওয়া যাবে ?

—বাঘ ভালুক হরিণ। পর্কুপাইন গিনিপিগ, ওয়াইল্ড বোরস্ সবই আছে।

সশব্দে হেসে উঠলো হাগিন্স।—য়্যানিমেল্‌স ? ওসব আমার হবি নয়।

—পাখি ?

—রিয়্যাল ইণ্ডিয়ান মেয়ে আছে সে জঙ্গলে ? লাইভ্‌লি গরম রক্তের মেয়ে আছে ?

ব্রিজলালের মোটরখানাকে পাশ কাটিয়ে যাবার রাস্তা করে দিলেন রাজেনবাবু। বাইক থেকে নেমে !

ব্রিজলালও গাড়ি থামাতে বললে কিষণলালকে।

—ডাগদারসাব যে। রুগী দেখতে চলেছেন ?

—না। রূপেয়ার খোঁজে।

ব্রিজলাল হাসলে। মাহাৎমাজীও বলতেন, আমি বেনিয়া। পাঁচ পাঁচ রূপেয়া না দিলে দস্তখত মিলতো না।

রাজেনবাবু খুশী হলেন যেন একটু! বিদায় নেবার জন্যে বললেন, চলি শেঠজী। কাজ আছে অনেক।

—দশ হাজার বিশ হাজার টাকায় কি শেঠ হওয়া যায় ডাগদারসাব। শেঠজী বলবেন না আমাকে। ব্রিজলাল হেসে বললে। তারপর আত্মগর্বে আপ্লুত হয়ে হঠাৎ মনে পড়েছে এমনি মুখের ভাব এনে বললে, তবে হ্যাঁ মাঝাং পাহাড়ের জঙ্গলটা ইজারা নিয়েছি। ভগবান কিরপা করলে শেঠ বনতেও পারি।

—তাই নাকি ? ভালো ভালো। লক্ষ্মী তো আপনাদের ঘরেই বাঁধা শেঠজী !

রাজেনবাবু বাইকে উঠলেন। কৃত্রিম হাসি হেসে।

ব্রিজলাল বললে, চলুন না একরোজ ডাগদারসাব, শিকার উকারের শোখ থাকে তো। মানিজার হাগিন্স সাহাবও যাচ্ছেন, আগে হপ্তায়। আপনার লেড়কিদেরও নিয়ে চলুন না, বহুত খুশি হবে বাচ্চারা।

প্যাডেল করতে করতে রাজেনবাবু বললেন, আচ্ছা ভেবে দেখি।

এদিকে তখন বাঁধানো বেদীটার ওপর দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে কাবেরী। সোলার হ্যাট আর সাইকেলের চলন্ত চাকা একটা ছোট্ট কালোর বিন্দুতে মিশে গেলো। পিছনে লাল ধুলো উড়িয়ে গেলো নীল রঙের মোটরখানা।

তন্ময়তা ভাঙালো কাবেরীর। হাতের ভিজে কাপড়টা মেলে দিতে দিতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠলো বুক নিঙড়ে।

—দিদি ! শিবু ছুটে এলো।

কাবেরী সস্নেহে তার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলে, কী রে ?

ঠোঁটজোড়ার ওপর কচি অনামিকার চাপ পড়লো আড়াআড়ি ভাবে। ইশারায় আর চোখমুখের সতন্ত্র সতর্কতায় শিবু জানালে, চু-প্ !

কাবেরী দ্রুত নেমে এসে শিবুকে সরিয়ে নিয়ে গেলো।

ফিসফিস করে বললে, আচ্ছা দাঁড়া। চট্ করে ঘরের ভেতর থেকে ঘুরে এসে কাবেরী জানালে, নেই। বল কী বলছিলি।

—অনুপমদা এসেছে।

কাবেরী হেসে বললে, কোথায় ? তোর সঙ্গে দেখা হলো ?

—হ্যাঁ, তোমাকে মন্দিরে যেতে বললে।

—আচ্ছা, বলগে যা একটু দাঁড়াতে। যাবো এখনি।

কাবেরীর স্বরটা একটু হয়তো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো, শিবু সাবধান করে করে দিলো—সুশু। আস্তে, মা শুনতে পাবে।

হাসলে।- ডেঁপো ছেলে!

শিবু ছুটে যাচ্ছিল, কাবেরী আবার ডাকলে।—শোন! ঘরে ঢুকলে কাবেরী। পুজোর উপচারে সাজানো রেকাবিখানা তুলে মা'র উদ্দেশে বললে, মন্দিরে চললাম মা। পুজোটা দিয়ে আসি।

ভেতর থেকে জবাব এলো, শিবুকে সঙ্গে নিয়ে যা।

—হ্যাঁ, নিয়ে যাচ্ছি। আয় শিবু। শিবুর উদ্দেশে ডাক দিলে।

চৌকাঠ ডিঙোবার সময় বললে, ডালটা চাপিয়ে গেলাম মা দেখো যেন পুড়ে না যায়। আর দীনভজন এলে বলো চৌবাচ্চাটা পরিষ্কার করে দিতে।

—আচ্ছা, দেরি করিসনে যেন। মা উত্তর দিলো।

তরতর্ করে দ্রুতপায়ে কাবেরী এসে পৌঁছলো মন্দিরে। এতোটা ঘোরপ্যাঁচ রাস্তা, দুমিনিট সময় লাগলো না তার। তাল রাখতে পারলে না শিবুও।

দূর থেকে চোখাচোখি হলো অনুপমের সঙ্গে। ফিক্ করে হেসে ফেলে পরক্ষণেই আবার গম্ভীর হয়ে এলো কাবেরীর মুখ। না এতো সহজে ভোলবার মতো ঠুনকো মেয়ে নয় ও। ঠাণ্ডা প্রকৃতি বলে কি রাগ থাকবে না শরীরে?

হিন্দুস্থানী পুরোহিতের সামনে রেকাবিটা রেখে শিবুকে অপেক্ষা করতে বললে। —খবদ্দার, উঠো না কিন্তু এখান থেকে। যতোক্ষণ না আসি বসে থাকবে।

শিবু ঘাড় নেড়ে মার্বেলের মেঝেতে বসে পড়লো।

কাবেরী সরে এলো মন্দিরের পিছনে, সারা অঙ্গে সিঁদুর মেখে হনুমানজীর মূর্তিটি যেখানে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে, তার আড়ালে।

কাছে আসতেই অনুপম বললে, বাব্বা, পাকা দু'টি ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি।

অভিমানের ভান করে রইলো কাবেরী। চোখ তুললো না। শুধু আস্তে আস্তে বললে, কথা বলবো না আমি তোমার সঙ্গে।

—সে কি? অনুপম হাসলে।

—হ্যাঁ, কোন সম্পর্ক নেই তোমার সঙ্গে।

—যারা দেখতে এসেছিলো, চিঠি দিয়েছে বুঝি পছন্দ হয়েছে বলে?

ক্রুদ্ধ চোখ তুলে অনুপমের দিকে তাকালে কাবেরী, উত্তর দিলে না।

অনুপম বললে, হপ্তায় একটা দিন দশ মিনিটের জন্যে কথা বলতে পাই, তাও যদি মুখ ভার করে থাকো, চলে কি করে বলো তো?

—বেশ তো, না এলেই পারো।

—রাগ করেছো, না? কিন্তু দোষটা কি করলাম, তা বলো?

এইবার অভিমানে ফেটে পড়লো কাবেরী।—দোষটা কি করলাম! এ দু'দিন ছিলে কোথায় শুনি?

অনুপম ওর কাঁধের দুপাশে দুটো হাত রেখে ওকে কাছে টেনে আনলে। আঁচলটা তুলে কাবেরীর মাথায় ঘোমটা টেনে দিতে দিতে বললে, বউ হলে তোমাকে ভারি সুন্দর মানাবে কিন্তু।

ফিক্ করে হেসে ফেলেই দাঁতে ঠোঁট চাপলে কাবেরী। কাঁধ থেকে অনুপমের হাতটা নামিয়ে দিলো কপট রাগে।

কাবেরীর নাকটা ঈষৎ টেনে দিয়ে অনুপম বললে, আহা চটছো কেন, শোনই না কি হয়েছিলো।

—কি হয়েছিলো? বলো, একটা কিছু তো তৈরী করেই এসেছো।

—না গো না। সত্যি বলছি, দু'দিন ধরে জ্বর হয়ে পড়েছিলাম।

—মিছে কথা।

—বেশ তো, তোমার বাবাকেই জিজ্ঞেস করে দেখো। সত্যি বাপু, তোমার বাবার মত এমন ডাক্তার দেখি নি। ঠিক্ একটি দাগ ওষুধ খেতে না খেতে—

কাবেরী হেসে ফেললে। বললে, এতোও মন জুগিয়ে চলতে জানো। যাই বলো, আমি বিশ্বাস করছি না তোমাকে।

—সত্যি কিনা টের পাবে দু'এক দিনের মধ্যই। ভয় দেখানোর স্বরে বললে অনুপম।

—কেন? কি করে টের পাবো?

—জ্বরের ঘোরে তোমার বাবার সামনেই যে তোমার নাম ধরে প্রলাপ বকেছি।

আশঙ্কায় চোখ তুলে তাকালে কাবেরী।—সত্যি? বাবার সামনে?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

—ছি ছি ছি। বাবা কী মনে করবে বলো তো! আর মা যদি শোনে—

—ঠেঙিয়ে পা খোঁড়া করে দেবেন তোমার, না?

—হাসছো তুমি? তুমি কী বলো তো? ছি ছি ছি, লজ্জায় আমি—

অনুপম হেসে বললে, ভয় নেই, প্রলাপ বকেছিলাম সত্যি, তবে তোমার বাবার সামনে নয়। একা একা।

জ্বরের ঘোরে বুঝি জ্ঞান থাকে? কী করে বুঝলে বাবা ছিলো কি না ছিলো?

—তাও তো বটে!

কাবেরী খিল খিল করে হেসে উঠলো এবার।—পাজী। সব মিছে কথা তোমার।

অনুপমও কৌতুকের হাসি হাসলে।

রোদ বাড়ছে। দুপুরের আগুনে সব যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। সাড়াশব্দ নেই, জনমানুষ নেই যেন কোথাও। শুধু কয়েকটা কাককোকিলের নিঃস্ব চিৎকার উষ্ণ হালকা হঠাৎ-ঝড়ের বাতাসে। দীর্ঘশ্বাস যেন। আর পায়ের তলায় বাঁধানো পাথরের আঙিনাও যেন জ্বরাতুর। উষ্ণ। শঙ্কিত অভিসারিকার মতো ব্যর্থ স্পন্দন বাতাসের বুকে। আর ভয়ার্ত নিঃশ্বাস।

মন্দিরের পিছনেই একটা মহুয়া গাছ। পাশেই আরেকটা। তার পাশে আরেকটা। ওদের পায়ের শব্দে একটা মেঠো খরগোশ ছুটে পালালো। একটা গাছের তলায় এসে বসলো ওরা দুজনে। অনুপম আর কাবেরী। লতাপাতার ঝোপের ভিতর থেকে একটা বহুরূপী একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে।

—কী ভাবছো?

হেসে চুপ করলো কাবেরী, উত্তর দিলো না।

—দুপুরটা বড়ো একা একা কাটে না? অনুপম আবার প্রশ্ন করলো।

উদাস চোখ মেলে কাবেরী উত্তর দিলো, আগুন জ্বালাতেই জানো।

একটা ঘাসের শিষ তুলে দাঁতে কাটলে অনুপম।—চাকরি ভালো লাগে না।

—চলো উঠি।

—বসো না আরেকটু। থাক্, চলো।

উঠলো না কেউই। বসে রইলো।

বসে থাকলে চলে না লখিয়ার। শাঁওনের বসে থাকাই কাজ। পাহাড়ের গা বেয়ে ভাঙা পাথরের বাধা ঠেলে ঠেলে নেমে আসছে রূপঝিলের স্রোত। মাঝাং পাহাড়ের আশ্লেষ স্বপ্ন বুকে বুনে ঢলে পড়ছে রূপঝিল। আর প্রতি পদক্ষেপে তার টুকরো পাথরের পুরুষালি বাধা। পরিরম্ভবিভ্রমার মতো কেঁপে নামছে নির্ঝরতরঙ্গ। সম্ভ্রমালিঙ্গিতা তটিনীর অকস্মাৎ আত্মসমর্পণ যেন। দোসরের খোঁজে দয়িতা ছুটেছে। পথের বাঁকে বাঁকে ত্রস্তগমনার ত্রস্তবসনে অচিন পুরুষের আকর্ষণকে আঘাতে উপেক্ষা করে ছুটে নেমে আসছে রূপঝিল।

ঝর্ণা যেখানে নদী হয়েছে। মাঝাং পাহাড়ের গায়ে ডেরা বেঁধেছে শাঁওন।

আগে কখনও হয়তো এখানে একটা শ্মশান ছিলো। এক-ইঁটের দেওয়ালে ঘেরা ক'খানা ঘর, টালিতে ছাওয়া একটুখানি চবুতরা।

কোণের দিকের ঘরখানা চৌকিদারের। শাঁওন আর লখিয়া বাসা বেঁধেছে সেখানে। আর আর ঘরগুলো, চত্বরের চারিপাশ নতুন করে গড়ে তুলেছে ব্রিজলাল। বনপতির আপিস আদালত আবাস সব কিছু। হপ্তায় দুদিন অনুপমকে এসে থাকতে হয় এখানে। তাই ওর জন্যও আছে একখানা।

মাসে তিন টাকা উপরি শাঁওনের। ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখার ভার লখিয়ার ওপর। পরিচ্ছন্নতা ভালবাসে ও, তাই

নিজের খুশীতেই করতো কাজটা। আর সেই সুযোগে উপরি তিন টাকার কথা চেপে গিয়েছিল শাঁওন। লখিয়াকে জানতে দেয় নি।

আজ নাকি ব্রিজলাল আসবে। জঙ্গল দেখতে। সঙ্গে আসবে ব্রিজলালের বন্ধু-বান্ধব, বাঙালীবাবু আর কোলিয়ারীর ম্যানেজার হ্যাগিন্স সাহেব। অনুপম খবর পাঠিয়েছে আগে থেকে।

শাঁওন হাতের লাঠিটা ছুরি দিয়ে চেঁছে সমান করতে করতে বললে, লখিয়া, ম্যানজারবাবুর কোঠি সাফ করে রেখেছিস?

ল্যাজে পা দেওয়া সাপের মত ফোঁস করে উঠলো লখিয়া। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে শাঁওনের দিকে।

ঝাঁঝিয়ে উঠে বললে, কেন? কেনা গোলাম নাকি আমি মানজারবাবুর? আমাকে কি তঙ্খা দেবে মাহিনা, যে ঝাড়ু লাগাবো ওদের ঘরে?

—নিমকহারাম!

—নিমক খাই আমি মানজারবাবুর?

—তো চাউল কেনবার রূপেয়া কে দেয়? ভাজিতরকারি কিনিস কোন টাকায়?

চৌকিদারীর জন্যে দেয়, ঝাড়ুদার নাকি আমি?

—বক্‌বক্ করিস না লখিয়া। ঘরগুলো সাফ করবি কিনা বল?

—না। বিবি না বাঁদী আমি তোর, যে হুকুম তামিল করবো?

রাগে দপদপ করে উঠলো শাঁওনের কপালের শিরাটা।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলো।—চুপ বদমাশ কাঁহাকা।

লখিয়া হাসলে।—চোর আর ডাকু বদমাশ নয়?

ব্যাস। পরমুহূর্তেই অস্ফুট একটা শব্দ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো লখিয়া।

চুপ করে বসে রইল শাঁওন, চৌকিটার ওপর। লখিয়াকে তোলবার চেষ্টা করলো না। ইচ্ছে হলো না লাঠিটা কুড়িয়ে

আনবার। লখিয়ার গোঙানিতেও টললো না। মরুক, মুর্দা টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে রূপঝিলের জলে।

কিন্তু মরবার মেয়ে নয় লখিয়া, শাঁওনের হাতে এমন অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে সে এর আগেও। চোটের দাগ শুকুতে লেগেছে দু'চার দিন, ফাটা কাটার ব্যথা যেতে।

তিন বছরের সংসার ওদের। ভালোবাসতেও যেমন উদ্দাম, বাসা ভাঙতেও তেমনি সময় লাগে না লখিয়ার। অদ্ভুত ধাতের মেয়ে।

বিয়ে হয়েছিলো লখিয়ার দলের সর্দার বুড়ো রতনলালের সঙ্গে। তারপর রতনলালের সঙ্গেই বিলাসপুর ছেড়ে এসে রেজার কাজ নিয়েছিলো রেলের কারখানায়। শাঁওনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ওর সেইখানেই। পালিয়ে এলো রাঁচী। লোহারডাগায় তখন নতুন লাইন খোলার কাজ হচ্ছে। তারপর। তারপর আরগাডা। কয়লাখনির অন্ধকার গহ্বর থেকে কয়েদখানার নিঝুম নিস্তব্ধতা।

ভাবতে বসলে সব ভালো করে মনেও পড়ে না লখিয়ার।

চুল্লীতে কাঠের জ্বাল বাড়িয়ে দিতে দিতে একবার উঁকি মেরে দেখলে। শাঁওন নেই কাছেপিঠে। সকালে সেই যে বেরিয়েছে ফেরে নাই এখনো। হয়তো অনুশোচনা হয়েছে।

নিজের মনে হাসে লখিয়া। ও যে আগেভাগেই ঘরদোর সাফ করে রেখেছিলো, শাঁওনের বলার আগেই—এ-কথা শুনলে কী ভাববে শাঁওন? হয়তো দুঃখ হবে তার, ভাববে মানজারবাবুর সঙ্গে পেয়ার হয়েছে তার। ভাবলে ভালোই। তাই চায় লখিয়া। কেনা বাঁদী নাকি ও শাঁওনের, না বিয়ে করা জরু!

ফুটন্ত জলের ডেকচিটা দু'হাতে ধরে চবুতরায় গিয়ে হাজির হলো লখিয়া।

আধ ডজন কেদারা পেতে বসে আছে ওরা। ব্রিজলাল, অনুপম, হাগিন্স সাহেব। আরো কয়েকজন। চেনা আর অচেনা।

—গরম পানি। অনুপমের চোখে চোখ রেখে লখিয়া বললে।

আর লখিয়ার যৌবনোচ্ছল দেহের দিকে মোহগ্রস্ত চোখে তাকিয়ে হাগিন্স হঠাৎ বলে উঠলো, হিয়ার্স এ গেম ফর মি।

—আমার কুঠরিতে রাখবি যা। অনুপম বললে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা চল্, আমিও যাচ্ছি।

লখিয়ার পিছনে পিছনে এলো অনুপম। ডেক্‌চিটা মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে লখিয়া বললে, চায় বানাবি বাবু?

—হুঁ এগুলো ধুয়ে এনে দে তো, জল আছে ঐ বাল্‌তিতে।

লখিয়া মৃদু হেসে পেয়ালাগুলো ধুতে শুরু করলে।

এক ফাঁকে পিছন ফিরে অনুপমকে বললে, সাদি কর বাবু, খুবসুরত একটা জরু নিয়ে আয়, সে করবে এ কাজ।

অনুপম বললে, জরু আনতে হলে যা জরুরত তা যে নেই। রূপেয়া কোথায়।

—মানজারবাবুর রূপেয়া নেই? খিলখিল করে অবিশ্বাসে হেসে উঠলো লখিয়া।

—করবো সাদি, একটা ভালো মেয়ে এনে দে।

—কোন কিসমের মেয়ে? মেমসাব না বাদশার বেগম?

—না সুন্দর হবে, এই ধর্—

—লখিয়ার মতো? নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠলো লখিয়া। তারপর চট্ করে উঠে পড়লো।

অনুপম হেসে বললে, হ্যাঁ, তোর মতো।

লখিয়া ফিরে দাঁড়ালো। বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বললে, খুনী আসামীর ঘর করি আমি।

অনুপম সহজ হবার চেষ্টা করে বললে, চা খাবি না?

লখিয়া উত্তর দিলে না। তর্ তর্ করে দ্রুত পায়ে চলে গেলো।

একটু পরেই এলো ব্রিজলাল। এক মুখ হেসে বললে, সব ঠিক হয়ে গেলো অনুপমবাবু।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে অনুপম।

—রূপেয়া লাগবে থোরাবহুৎ। আর—

—আর ?

হাসলে ব্রিজলাল।—দু'দিন বাদ, এতো জলদি কিসের। হাঁ, পান্‌শো রূপেয়া ইনাম মিলবে তোমার। কাজ হাঁসিল করলে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত।

জানালা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অনুপম। চোখ ছুঁড়ে দিলে বাইরের দুনিয়ায়। না-নিদ্ নিশীথের অন্ধকার আসমানে। দূরে কোথায় একটা ময়না না মুনিয়া শিস দিচ্ছে মেকি স্বরে। আর ঠাণ্ডা বাতাস। দেওয়ালের গা ঘেঁষে উঠেছে একটা কিশোর আমলকী গাছ। শিরশির করে নড়ছে পাতাগুলো। নির্বাতি রাত। শব্দ নেই, নেই এতটুকু আওয়াজের লেশ। না, দূরের রেল লাইনে একটা মালগাড়ির শান্টিং ধ্বনি তুলছে। ঝন্ ঝন্ ক্যাঁচ ক্যাঁচ নানা রকমের ভাঙা টুকরো শব্দ! হঠাৎ-জাগা কঙ্কালের প্রতি-অঙ্গের ঠক ঠক আওয়াজ উঠলো যেন।

লণ্ঠনটা জ্বেলে টেবিলে রাখা টাইমপীসটার দিকে তাকালে অনুপম। না। সময় হয় নি এখনো।

হুস হুস শব্দ করে ইঞ্জিনটা এগিয়ে গেলো। ছোঁ-মারা চিলের মত দ্রুত। মাটিতে পা পড়ে না যেন।

ধোঁয়া দেখা গেলো না। শুধু খুচরো কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ বিপরীত বাতাসে উড়ন্ত আঁচলের মতো পিছনে দুলতে দুলতে নিবে গেলো।

কুঁজোটা উপুড় করে তুলে ধরে ঢকঢক করে খানিকটা ঠাণ্ডা জল খেলো অনুপম।

জংশন-স্টেশন ছোটামুরীর বিশ্রামঘরে ব্রিজলাল হয়তো ঘুমের ঘোরে নাক ডাকাচ্ছে এতক্ষণে। আর শাঁওন? না, বিশ্বাসঘাতক নয় ও। জেগে বসে পাহারা দিচ্ছে ব্রিজলালের জিনিসপত্তর। লাতেহার থেকে দূরে, আরগাডা থেকে দূরে। হ্যাঁ, লখিয়ার কাছ থেকে অনেক দূরে।

রেলের স্লিপার পাসিং অফিসার এসেছে ইন্‌স্পেকশনে। নতুন ঠিকাদারীর লোভে ছায়ার মত পিছনে পিছনে ঘুরছে ব্রিজলাল আর ব্রিজলালের পিছনে শাঁওন।

—খুনী আসামী ও।

লখিয়ার কথাটা মনে পড়লো। একটা কেমন যেন ব্যথা বোধ করলে অনুপম। মায়া, মমতা, মোহ।

না। তার চেয়ে বড়ো টান বোধ করছে অনুপম। অন্য দিকে। কর্তব্য অপেক্ষা করছে তার পথ চেয়ে। রাত গভীর হয়ে আসুক। নিস্তব্ধ হয়ে যাক সারা দুনিয়া। তারপর!

কাবেরীর চোখে অশ্রুর কণা চকচক করছে। কাবেরী, কাবেরী! কি এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ, আস্বাদ-অনভ্যস্ত অপূর্ব এক মিষ্টতা। কাবেরী, কাবেরী।

বিছানায় শুয়ে পড়লো অনুপম। ঘুম নামছে না তার চোখে। না, ঘুম চায় না ও, ঘুমকে সরিয়ে রাখতে চায় আজ।

শার্টের বুকে লেগেছিলো দুফোঁটা চোখের জল। বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে অনুপমকে আঁকড়ে ধরে থরথর করে কেঁপে উঠেছিলো কাবেরী। কান্না রোধ মানাতে পারে নি।

অশ্রু দু'ফোঁটা শুকিয়ে গেছে, তখনই হয়তো শুকিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু। হ্যাঁ, আজও যেন বুকের সেই জায়গাটায় তপ্ত অশ্রুর আর্দ্র স্পর্শটুকু অনুভব করছে সে।

গেছে।

বুকের ওপর ভেঙে পড়ে কাবেরী জানিয়েছিলো, তার সুখের শেষ হতে চলেছে। অনুপমকে উদ্ধারের পথ খুঁজে বের করতে অনুরোধ জানিয়েছিলো সে। না, না—এমন অনাকাঙ্ক্ষিত বিবাহ-মিলনের ভার যদি তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে—না, কাবেরী বাঁচতে পারবে না।

অনুপম ভরসা দিয়েছিলো, ভয় কি!

কাবেরীর সজল চোখ খুশীতে ভরে উঠেছিলো। আরো, আরো কিছু শোনবার আশায় মুখ তুলে তাকিয়েছিলো কাবেরী।

—সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে পারি, সব লোকসান সয়ে। কিন্তু, কোথায় যেতে চাও কাবেরী?

—যেখানে খুশী তোমার, যেদিকে ইচ্ছে। শুধু অনেক দূরে।

আর ভাবতে পারে না। ক্রমশই অধৈর্য হয়ে উঠছে অনুপম।

ধীরে ধীরে ঘড়িটার কাছে সরে এলো অনুপম। কান পেতে পরীক্ষা করলে ঘড়িটা চলছে কি না। টিকটিক টিকটিক শব্দ শুনে সন্দেহ দূর হলো।

লখিয়াটা হয়তো ভীতু ভাববে অনুপমকে। হয়তো মনে মনে বলবে, মরদ নও তুমি, জেনানার জান তোমার ছাতির নীচে।

বুকের একটা কোণে কেমন যেন খচ খচ করে লাগে।

—ছত্তিশগড়ের রয়তাইন আমি, মাটির পুতলি নই।

তপ্ত নারীদেহের সক্ষম আলিঙ্গন অনুভব করছে যেন অনুপম, বুকের কাছে। তার সারা দেহ অবশ হয়ে পড়েছে, মুখের ওপর যেন নেমে আসছে উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের মদির নেশা। কিন্তু। লখিয়া নয়, কাবেরী। দেহ নয়, মনের ভিখারী সে।

লখিয়া দুঃখ পাবে। তা পাক্, কাবেরী এতক্ষণে হয়তো উঠে বসেছে। হয়তো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ঘড়ির কাঁটার দিকে।

কাবেরী। অনেক অনেক দূরে কোন এক অজানা দেশে নতুন

:খবে অনুপম। জানা শহরেও যেতে পারে। জনতার জঞ্জালে .নশে গিয়ে সংসার বাঁধবে।

আচ্ছা, লখিয়া .কি ব্যথা পাবে? সত্যিই কি অনুপমকে ভালোবেসেছে লখিয়া? ভালোবাসা? মনে মনে হাসলে অনুপম, এমন উদ্ভট কল্পনাও তার মন জুড়ে বসতে পারে! পাহাড়ী নুড়ির মতো এখানে ওখানে ঘা খেয়ে অনেক পথের স্পর্শ কুড়িয়ে নীচে গড়িয়ে পড়াই যার জীবন, সেও ভালোবাসবে! আর তাও কিনা অনুপমের মতো সরল পথের পান্থকে!

ভুল! অনুপমেরই মনের ভুল!

জারার আগুন ওর চোখের তারায়, বুকে অরণ্যতুফান। শুধুই চলার উন্মাদনা, জীবনের উন্মাদনায় মানুষ লখিয়া। মুক্তির নেশাতেই ওর ঘর ভাঙা। পৃথিবীতে আরো মানুষ আছে, আরো বন্ধন, তা যদি জানতো লখিয়া। ও যেন একাই দুনিয়ার সম্রাজ্ঞী। পর ইচ্ছাই যেন আকাশ, মাটি, আলো। নাকি রোদ, বর্ষা, জনারের ক্ষেতে তাদের প্রাণস্পন্দনের তিল তিল দিয়ে গড়ে তুলেছে লখিয়ার তিলোত্তমা মন? বেড়া মানে না, বাঁধ মানে না। কোন ঝুটা কানুন, কোন মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়বার মতো লাক্ষার কীট নয় ও। জালে জানালা বন্ধ হবার আগেই পায়ের সুতো কেটে ফেলতে ভয় পায় না, মুছে ফেলতে সময় লাগে না স্মৃতির পদচিহ্ন।

মাঝাং পাহাড়ের জঙ্গল বুঝি বা লখিয়ার মনকে ইজারা নিয়েছে। আরণ্যক আদিম-কন্যা লখিয়ার শরীরে শুধুই জীবনের উত্তাপ, মনের শোণিত শিরায় শুধুই প্রাণস্পন্দন।

তবু কোথায় যেন একটা কোমল কামনার আশ্লেষ বোধ করছে অনুপম। লখিয়া। মধুর নয়, মনোরম নয় এ নাম। কি এক কঠিন দৃঢ়তা এই নামটিতে, কি এক অফুরন্ত যৌবনের ডাক।

—বাবুজী, বড় বেদর্দী মানুষ এই শাঁওন। ওর কাছ থেকে আমাকে নিয়ে চল্ বাবুজী, ওর হাতে আমাকে একদিন না একদিন জখম হতে হবে হয়তো। চুল্লীতে বড়ো বড়ো ভিজে কাঠের জ্বাল ঠেলতে ঠেলতে বলেছিলো লখিয়া। আর সারা মুখ ওর ধোঁয়ায় আবছা হয়ে গিয়েছিলো বলেই সেদিন লখিয়ার চোখের জলকে চিনতে পারে নি অনুপম।

বলেছিলো, আমাকেও তো একদিন এমনি ছেড়ে পালাবি, হয়তো হাগিন্সের সঙ্গেই।

—আফসোস। সুর টেনে টেনে বলেছিলো লখিয়া, তারপর চোখেমুখে কৌতুকের হাসি ছিটিয়ে বলেছিলো, ডেরা বাঁধার আগেই ডর লাগার মেয়ে নই আমি। গাছ থেকে সর্বতী তোলবার আগেই খাট্টা হবে কিনা ভয়? সারা শরীরে হিল্লোল তুলে হেসেছিলো লখিয়া।

—কোলিয়ারীর ওই হাগিন্স সাহেবটার যে নজর পড়েছে তোর ওপর।

—সে আর সমঝাতে হবে না, পয়লা দিনেই টের পেয়েছি আমি। মরদ লোকের দিল তার চোখের শিশায় দেখতে পাওয়া যায়।

অনুপম ঠাট্টার সুরে বলেছিল, মেয়েদের চোখে কিন্তু আয়না নেই, আছে দিল জখমী বল্লমের ভালা।

তবে আর ভয় কি, তেমন ইরাদা থাকলে না হয় ভালার খোঁচাতেই কয়লা-সাহাবকে খতম করে দেব। উত্তর দিয়েছিলো লখিয়া, চোখে বিদ্যুতের চমক দেখিয়ে।

হেসেছিলো অনুপম। ওর কথায়। বলেছিলো, মতলব বদলাতে কতক্ষণ। আমার মত কৌপীন ফকির কি ও? দৌলতওয়ালা হাগিন্স সাহেবের সঙ্গে কি পেরে উঠবো মোহব্বতের খেলায়?

উনুনে ফুঁ দিতে দিতে হঠাৎ কথাটা শুনে পিছন ফিরে

তাকিয়েছিলো লখিয়া, তারপর মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মুখে তার একটা অদ্ভুত অবোধ্য কাঠিন্যের ছায়া পড়েছিলো।

—পিয়ারের আদমির সঙ্গে ভাগতে ভয় পাই না আমি। তা বলে রূপেয়ার লালচ আছে ভেবো না। মোহর নয়, মোহব্বৎ। পিয়ার। বলেছিল লখিয়া।

নাঃ, এসব কী ভাবছে অনুপম? ঘড়ির কাঁটার দিকে আরেকবার তাকালে সে। কাবেরী হয়তো এতক্ষণ উঠে দাঁড়িয়েছে। এইবার নিঃশব্দ পায়ে হয়তো বেরিয়ে আসবে। মনে মনে শেষ বিদায় জানাবে সকলকে। তারপর ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াবে বাইরের ফাঁকা বাতাসে।

কাঁপতে কাঁপতে ভয়চকিত পায়ে এসে দাঁড়াবে কাবেরী। ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের গার্ডপোস্টের আড়ালে এসে, তারপর শুরু হবে ওদের যুগ্ম-যাত্রা।

—পানশো রূপেয়া ইনাম! কি আশ্চর্য, এখনো লোভের ইশারা ভাসছে ওর চোখের সামনে? নিজের মনেই হাসলে অনুপম। এতো সস্তায় শয়তানের কাছে নিজেকে বিক্রী করবে ও, ভাবলো কি করে ব্রিজলাল। লখিয়ার যৌবনের মূল্য দিতে পারলো না, এই তো একমাত্র দুঃখ অনুপমের। হাগিন্স আর লখিয়ার মধ্যে ঘৃণ্য যোগসূত্র হবে ও? বদ্ধ উন্মাদ ব্রিজলালটা।

কিন্তু বড়ো ক্লান্তি বোধ করছে অনুপম।

তা হোক। কাবেরী অপেক্ষা করছে, কর্তব্য পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে। ঐশ্বর্য চায় না ও, চায় প্রেম।

অনুপম উঠে দাঁড়ালো।

মিঠে রাগিণীতে সান্ধ্যসানাইয়ের সুর ভেসে চলেছে। অবিরাম কেঁদে চলেছে বিরহী বাঁশীর সুর। সানাই বেজে চলেছে।

বাড়ির দক্ষিণে, বাগানের ওপাশে খানিকটা মাঠ ঘেরা হয়েছে তেরপলে। লাল শালুতে মোড়া বিবাহমঞ্চ। কারবাইডের আলোয় ঝলমল করে উঠেছে সারা মণ্ডপ। লাল মেঘের উন্মাদনা এনেছে রক্ত-বস্ত্রের আচ্ছাদন। ওপরে মখমলের চাঁদোয়া। একটা বিরাট চক্র রঙ বদলে বদলে কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিয়ে গেছে ঠিক মাথার ওপর। এদিকে ওদিকে ঝুটা মোতির ঝালর।

সানাইয়ের সুর থামছে না, দূরবন্ধু চক্রবাকীর কণ্ঠকাকলীর মতো ককিয়ে কেঁদে উঠছে যেন।

কাবেরীর চোখের জল শুকিয়ে গেছে। কান্না নেই, দুঃখ নেই। যেন সব চিন্তা, সকল ব্যর্থতার ব্যথা চাপা পড়ে গেছে আজকের এই উজ্জ্বল জ্যোছনায়। আনন্দের উন্মত্ততায়!

একদল মেয়ে উঠে পড়ে লেগেছে কাবেরীকে সাজিয়ে তুলতে। বেনারসী শাড়ির ফাঁকে কাবেরীর সুন্দর মুখখানা কেমন মৌনবিষাদে ভরা। তবু, কত অপরূপ রূপের প্রকাশ। চন্দনের ফোঁটায় সাজানো ছোট মুখখানা নেড়েচেড়ে দেখছে মেয়েরা। কৌতুকহাস্যে নয়তো নিজেদের রসিকতায় নিজেরাই লুটিয়ে পড়ছে।

খুশীতে অধীর যেন সকলে।

শুধু রাজেনবাবুর গলার স্বর ভারি হয়ে আসছে। ক্ষণে ক্ষণে চশমার কাচ মুছছেন। আর কাবরীর মা চেষ্টা করছেন সকলের সঙ্গে হেসে কথা কইবার।

অমিতাভ হঠাৎ বললে, করেছিস কি দিদি! এ যে রাজসিক ব্যাপার। এত দানসামগ্রী এই বাজারে?

রাজেনবাবুর কাছেই ছিলেন। বললেন, আমার একটা পোজিশন আছে তো। না করলে চলবে কেন? আমার খ্যাতি সুনাম বংশগৌরব—

বাধা দিয়ে অমিতাভ বললে, খরচটার দিকেও তো একটু চোখ

রাখতে হয়। টাকা জিনিসটা থাকলেই যে জলে ফেলে দিতে হবে, তা তো নয়।

রাজেনবাবু মৃদু হাসলেন। কাপড়ের খুঁটটা চোখে রগড়ে নিলেন, যেন কী একটা পড়েছে এমনি ভান করে। তারপর বললেন, সবচেয়ে বড়ো সম্পত্তি আমার কাবু মাকেই যখন—

কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি। কী যেন কাজ মনে পড়ায় ছুটে গেলেন।

মা'র দীর্ঘশ্বাসটা শুনতে পেলো কাবেরী।

'ওর চিবুকটা নরম করে তুলে ধরে কাবেরীর মা বললেন, ছিঃ মা, কাঁদতে নেই আজ। কাঁদতে নেই, চোখ মোছো। বলে নিজেই চোখ মুছলেন।

কাবেরীর হঠাৎ মনে হলো, মাকে সে কত ভালোবাসে। মা, বাবা—সকলকে।

হ্যাঁ। আর একজনের কথা মনে পড়ছে। অনুপম কি ওকে ক্ষমা করতে পারবে? কে জানে। একটা অসহনীয় গভীর দুঃখের মোচড় অনুভব করে কাবেরী, তার ছোট্ট বুকে উথলে ওঠে ব্যর্থতার বাষ্প।

সেদিন হয়তো সারা রাত কাবেরীর অপেক্ষায় কাটিয়ে দিয়েছে অনুপম। কে জানে। কাবেরী মনে মনে বললে, আমাকে ক্ষমা করো তুমি। এ ছাড়া যে উপায় ছিলো না। ক্ষমা করো তুমি!

লাল বেনারসী, প্রসাধিত রূপ। কপালে চিত্রচন্দন, সিঁথিতে মুক্তোর সিঁথিমউর। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে কাবেরীকে। নতুন ফোটা গোলাপের মতো।

ধীরে ধীরে উঠে এসে পুবের খোলা জানালায় দাঁড়ালো কাবেরী। ঠাণ্ডা গরাদের ফাঁকে গাল দুটো চেপে। তারপর একবার হঠাৎ তাকালে ওপরের আকাশে।

একটা বড়ো তারা উঠেছে আকাশের কোণে।

—আমার খ্যাতি, সুনাম, বংশগৌরব।

রাজেনবাবুর কথাটা, হ্যাঁ, কথাটা কেমন যেন পুরোনো ঠেকলো কাবেরীর কানে। অনেক, অনেক পুরোনো। তবু, কেমন যেন নতুন মনে হয়।

দূরের অন্ধকারে এগিয়ে আসছে একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। একখানা মোটর ছুটে আসছে এদিকে। কাবেরী সরে এলো।

না। কাবেরীর দিকে ওদের চোখ নেই।

তুফানের বেগে ছুটে চলেছে ব্রিজলালের নীল রঙের মোটরখানা। হাউই থেকে খসে পড়া ফুল্‌কির মতো দ্রুত বেগে।

হাগিন্স সাহেবের বাংলোর পথে চলেছে।

অকস্মাৎ-সানাইয়ের শব্দে চমকে উঠলো অনুপম। দূরের মণ্ডপ থেকে ঝলমলে আলোর কয়েকটা সূক্ষ্ম রশ্মি এসে পড়েছে বাইরের মাঠে। সানাই বেজে চলেছে।

নিজেরই অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে অনুপম। লখিয়া চমকে তন্দ্রাজড়িত চোখ তুলে তাকালে অনুপমের দিকে। তারপর ঘুমের ঈষৎ ঘোরে মৃদু হেসে আরো কাছে সরে এলো। আরো নিবিড় করে আঁটলে আপন আলিঙ্গনে, অনুপমের কাঁধের ওপর মাথা ঢলে পড়লো। বেহুঁশ হয়ে। তাড়ির নেশায়।

কাবেরী হয়তো কাঁদছে। সত্যি, এত আন্তরিক ভালোবাসার কোন প্রতিদান দিতে পারলে না অনুপম। দিতে পারলে না কাবেরীর বিশ্বাসের মর্যাদা। তা হোক্! এই ভালো। শুধু একটা মুহূর্তের ভুলে কি না হতে পারতো! সেদিন রাত্রের কথা মনে পড়লো। দরজা খুলে বেরিয়ে আসতো অনুপম আর একটু হলেই। তারপর?

কাবেরীর জন্যে অনুপম দুঃখের মোচড় অনুভব করে। হয়তো, কে জানে, হয়তো সেদিন সারা রাত্রি নিস্তব্ধ নিশীথের অন্ধকারে প্রতীক্ষার প্রহর গুনে গুনে কাটিয়েছে কাবেরী। অনুপমের দেখা

পায় নি। ব্যর্থতার বিরহ বুকে নিয়ে হয়তো ফিরে গেছে শেষ রাতে।

চলন্ত মোটর থেকে দূরের আকাশের দিকে তাকালে অনুপম।

আকাশের কোণে একটা বড়ো তারা উঠেছে।

পান্‌শো রূপেয়া ইনাম আর ব্রিজলালের বেসাতিতে এক আনা অংশ। হাগিন্স সাহেবের বাংলো বেশী দূরে নেই আর।

হেডলাইটের আলোটা চোখে পড়লো হাগিন্সের। চমক্ ভাঙলো যেন তার।

স্বপ্নাবিষ্ট চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে যেন। চেষ্টা করে চোখ তুলে তাকালে হাগিন্স অদূরে চলন্ত মোটরের আলোর প্লাবন পড়েছে যেদিকে। তারপর দৃষ্টিটা ঘুরে এলো ঘরের ভেতর। সার্চলাইটের মতো চোখ বুলিয়ে গেলো সে ঘরের প্রতিটি কোণে, প্রতিটির সামগ্রীর ওপর।

ছোট্ট গোল টেবিলটার ওপর হুইস্কির বোতল জমে উঠেছে। বোতলে ডিকেন্টারে ঠোকা লেগে ঠুং করে আওয়াজ হলো একটা।

আরাম কেদারায় এলিয়ে বসেছিলো হাগিন্স। হঠাৎ টলে ঝুঁকে পড়লো গোল টেবিলের ওপর। কনুইয়ে ভর দিয়ে।

সুরার নেশায় সব কিছু ভুলে গেছে হাগিন্স। ঘামে ভেজা কপালের ওপর খুচরো কয়েকটা তামাটে চুল স্প্রিংয়ের মতো পাক খেয়ে লেপটে আছে। চোখে অদ্ভুত এক আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনা।

হাগিন্স চুপ করে বসে রইলো কিছুক্ষণ। একদৃষ্টে নিঃশেষ বোতলটার দিকে চেয়ে। বিড়বিড় করে কি যেন বললে নিজের মনে।

—রীচেস্? ওয়েল্‌থ? নিজের মনকে যেন প্রশ্ন করলে হাগিন্স।

হঠাৎ একটা হাতের ঝটকা টানে ফেলে দিলে ফাঁকা বোতলগুলো। ঝন্ ঝন্ শব্দ তুলে কাচের টুকরোগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

—রেস্‌পেক্‌টেবিলিটি? ডিগ্‌নিটি? অনার?

কিছুক্ষণ তন্দ্রাতুর নেশার চোখে চেয়ে দেখলে কাচের টুকরোগুলোর দিকে। নিঃশব্দে নিশ্চুপ তাকিয়ে রইলো। অনেক দূর থেকে, বহুদূর থেকে কি যেন মিঠে মিউজিকের সুর ভেসে আসছে থেকে থেকে। বাতাসের গমকে আশ্চর্য এক মন মাতানো অর্কেস্ট্রার অনুরণন বেজে উঠেছে।

সুরে সুর মিলিয়ে শিস দিতে দিতে উঠে এলো হাগিন্স। জানালার পারে ঠেস দিয়ে তাকালে বাইরের পৃথিবীর দিকে। নিঃসীম অন্ধকারের দিকে। আকাশের দিকে।

ইউকেলিপটাস গাছের সাদা গুঁড়িটার পাশে একটা বড়ো তারা উঠেছে।

হঠাৎ একটা গানের কলি ভেঁজে উঠলো হাগিন্স।

—ফর মাই লাভ, ফর মাই লাভলি ইয়াং লে-ডি।

পাশের বাংলোর রেডিওতে বিলিতি গান বেজে উঠলো।—ডে-জি, ডে-জি!

পৃথিবীর আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত চাঁদ হয়তো দেখা দেবে। আর এক কোণে তিনটে বড়ো বড়ো তারা। হয়তো রাত আরো বাড়বে। ঘুমিয়ে পড়বে সারা দুনিয়া। রাজেন ডাক্তার, ব্রিজলাল, হাগিন্স। কাবেরী, অনুপম, শাওন। আরও অনেকে। সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। শুধু জেগে থাকবে আকাশের প্রান্তে তিনটে বড়ো বড়ো তারা।

খ্যাতি, ঐশ্বর্য, প্রেম।

মাথায়

রেব

ছে

মা ৫

আশপাশের পাঁচটা কোলিয়ারির ভিড় ভেঙে পড়লো কারানপুরার বুকে। কারানপুরা—যার আদি নাম কর্ণপুর।

কিংবদন্তী শোনা যায়, মহাভারত-চরিত্র কর্ণের রাজধানী ছিল এটা। দুসাদ দুবে মাহাতো সিংরা শুধু বলেই খালাস নয়। পাহাড়ের গায়ে এক সারি প্রাচীন গুহার দিকে আঙুল দেখিয়ে জানায়, ওই হলো কর্ণের দরবার। অরণ্যচর বীরহড়দের যে দলটা তীর ছোঁড়ার সময় বুড়ো আঙুলটা মুড়ে রাখে তাদের দেখিয়ে বলে, একলব্যের বংশধর ওরা।

কে কি বলছে না বলছে, জংলা ডেরার সান্তালরা অবশ্য তার খোঁজ রাখে না। খোঁজ রাখে না, তবে রাখে কান। ঢেঁড়া কাঠির ডুগডুগির দিকে। সে ডুগডুগি মাঝে মাঝে জানিয়ে দেয়, লোক লাগবে বাঁশরিয়ার খাদানে, কিংবা নাটুয়া দল তাঁবু ফেলেছে ঝিন্‌কাগাড়ায়।

এমনি এক ডুগডুগির ডাক শুনেই মেয়েমরদের ভিড় ভেঙে পড়লো কারানপুরার রামলীলার মাঠে।

ভিখারিয়ার নাচ এসেছে, ভিখারিয়ার নাচ। নামে নাচ আসলে গান। কানে আঙুল দেওয়া কবিগানের লড়াই। যা শোনা আগ্রহে আঠারো ক্রোশ পথ হাঁটতেও উৎসুক হয়ে ওঠে ছেলো। কোলিয়ারির হড় হো ভুম্পি খাড়িয়া রেজাকুলির দল।

তাই ডুগডুগি শুনতে না শুনতে প্লাবন নামলো

মাঠে, কুলি কামিন আর জোয়ান সাঙা, বাচ্চা বুড়ো হাড়াম হপন্, সবাই।

ভিড়ের মুখে গা ভাসিয়ে রূপমতীও এসে পৌঁছলো। পৌঁছলো যখন, তোতা আর ম্যোর ভিখারিয়া ছাড়ে নি তখনও।

'ভিখারিয়া হলো গ্রামের নাম, তা থেকে ভিখারিয়ার নাচ!' বোঝালেন কারানপুরা কোলিয়ারীর কম্পাসবাবু।

মারাঠী ম্যানেজার সাঠে সাহেব মাথা নাড়লেন। ও তল্লাটের চীফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ডিক্সন আর এজেন্ট ফার্নহোয়াইট চুরুট চাপা ঠোঁটে বললেন, আই সী!

সব কৃতিত্বটুকু কম্পাসবাবু নিয়ে নিচ্ছেন দেখে কনুয়ের ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে এলেন মিশীরজী। বললেন, তোতা পাখী আর ময়ুর সেজে দু'জন লোক আসবে এখনি, নাটকটার কাহানী বলে দেবে।

কাহানী? ফার্নহোয়াইট ভুরুতে প্রশ্ন তুলে তাকালেন।

নিমন্ত্রিত সাহানা বললেন, কাহানী না ছাই। ভিলেজ স্ক্যাণ্ডাল, যত সব কেচ্ছা ভিন গাঁয়ের মেয়েদের নামে। ছড়া বেঁধে গাইবে ওরা, আর পারে তো সে গাঁয়ের লোক জবাব দেবে গান গেয়ে! না পারে তো লাঠিসোটা নিয়ে হৈ হৈ করে উঠবে।

মিশীরজী সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ স্যার। ভিখারিয়ার নাচ হয়েছে অথচ দু' চারটে খুন-জখম হয় নি এমন ঘটনা আমরা অন্তত শুনি নি।

বলতে না বলতেই হৈ হৈ চিৎকার উঠলো ওদিক থেকে।

না। মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপার নয়। তোতা আর ম্যোর দেখা দিয়েছে বাঁশ দিয়ে ঘেরা আসরের মাঝখানটিতে। তোতার মাথায় সাদা পালকের ঝুঁটি, ম্যোর অর্থাৎ ময়ূরের পেখম আঁটা রেকজনের বুকে পিঠে। হঠাৎ দেখলে ভয় পাবার মত চেহারা রছে দু'জনেরই। দু'জনেই সুর করে গান শুরু করেছে। মূল

গায়েন যতক্ষণ না এসে পৌছয় দলবল নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখার দায়িত্ব এদের।

তোতা আর ম্যোরকে আসতে দেখেই আনন্দে হৈ হৈ করে দাঁড়িয়ে উঠেছে কুলিকামিন কোড়াকুড়ির দল।

বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা আসরের চারপাশে উবু হয়ে বসা নোংরা জনতার ভিড় যে কতদূর অবধি ছড়িয়ে গেছে ঠাহর হয় না। আর জনতাকে ঘিরে এক সারি ফার্নেসের মত বড় বড় আগুনের কুণ্ড। কারানপুরার খাদানে কয়লা থাকতে শীতে কাঁপবে কেন লোকগুলো, ফার্নহোয়াইট তাই পঁচিশ বাকেট কাঁচা কয়লা স্যাঙশন করেছেন। অগ্নিকুণ্ডের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে সেগুলো, আসরকে চারপাশে থেকে মালার মত ঘিরে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী তো নয়, যেন সিন্ধবাদের কুড়িয়ে পাওয়া হাঁড়ি থেকে দুলে দুলে উঠছে এক একটা দৈত্য।

দেহাতীদের থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখে বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে বসে দেখছিলেন ফার্নহোয়াইট, ডিক্‌সন, সাঠে, ঠিকাদারের দল আর সাহানা। শেষ জনের ইঙ্গিতেই কে যেন সামনের টুলে দু'বোতল হুইস্কি আর আনুষঙ্গিক রেখে গেল।

ফার্নহোয়াইটের কিন্তু সেদিকে চোখ ছিল না। দোষও দেওয়া যায় না। কাছে-পিঠে রূপমতীর মত মেয়ে শরীর কাঁপিয়ে ঘুরে বেড়ালে কি অন্যদিকে চোখ যায়!

সাঁওতালদের ভিড়ে এমন মেয়ে? আশ্চর্য হয়েই তাকিয়েছিলেন ফার্নহোয়াইট। আর তা লক্ষ্য করেই ঠিকাদার সিং ফিসফিস করে বললে, রূপমতী! আমাদের তিন নম্বর খাদে কাজ করে মেয়েটা।

রূপমতী? ফার্নহোয়াইটের বাউণ্ডুলে ছেলেটা যার পেছনে ছায়ার মত ঘুরতে চায়?

খাদানে নেমে তার আজ মাটি-কাটারি প্লটে, কাল মাল-কাটারিদের কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করা, মেয়েপুরুষ কারও চোখ এড়ায়

নি। কানাঘুষো ফিসফিস, চোখে হাসি, মুখে আঁচল-চাপা কৌতুক বোধ করেছে রেজামেয়ের দল। সবাই লক্ষ্য করেছে কার খোঁজে জল-কাদা ডিঙিয়ে কালো কয়লার অন্ধকূপে নেমে আসে ম্যাকু। লক্ষ্য করে দেখেছে, রূপমতী যখন মাল-বোঝাই ঝুড়িতে ঝাঁকানি দিয়ে সেটা মাথায় তুলে ফিরে দাঁড়ায় আর চোখাচোখি হয় ম্যাকুর সঙ্গে, তখন হঠাৎ যেন তৃপ্তির ঝর্ণা নামে বাউণ্ডুলে সাহেবটার মুখেচোখে। আর রূপমতীও বোধ হয় ছোক্‌রা সাহেবের নির্লজ্জ পাগলামি দেখে ফিক্ করে হেসে ফেলেই মুখ গম্ভীর করে।

কিন্তু দিনের পর দিন এমনি একভাবে আসা, দেখা হওয়া, হাসি কৌতুক···কেমন যেন নেশা ধরে যায় রূপমতীর। ঝুড়িটা উল্টে নিয়ে তার ওপর বসে পা ছড়িয়ে একদিন লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে গল্প না করতে পেলেও বোধ হয় মন খারাপ হয় না রূপমতীর। মন খারাপ হয় দৈনন্দিন নেশা না মিটলে।

এদিকে কানাঘুষো হাসাহাসি থেকে ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বেশ টের পাচ্ছিলো রূপমতী। পট্টীর বুড়াবুড়িরাও বলাকওয়া শুরু করেছিলো। লালোয়া কুড়ুখও বেজাত, কিল্লির মিল নেই। তবু তাকে নিয়ে রটনার মৌমাছি গুন্‌গুন্ করে না। যত আপত্তি ম্যাকু-সাহেবের বেলা।

সাহেব। ও হলো আমাদের শত্রুর জাত। চান্দো বোঙা পাপের জল ছিটিয়ে দিয়েছে ওদের ওপর। ধরম নাই ওদের, তাই সান্তালদের ধরম নষ্ট করতে এসেছে ওরা। চান্দো বোঙার কাছ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে খিস্টেন করে দেয় ওরা। যেমন করেছে ওই মরিয়ম, সেবাস্তিনা, মেরিয়া, রেজিকে।

তাই রূপমতীকেও সাবধান করে দিয়েছিলা পট্টির সর্দারনী। মুণ্ডা গিতিওড়ার মেয়েদের, ওঁরাও ধুমকুড়িয়ার কুমারী মেয়ের দলকেও।

সাওতাল পাড়ার ছিমছাম মেয়ে সোনামিরু কানে কানে রূপমতীকে বলেছিলো, বুড়ারা নজর রাখছেন তুয়ার পানে।

সোনামিরুর এই সাবধান-বাণী শুনেই ভয় পেয়ে গেল রূপমতী। বুড়ারা নজর রাখছেন। কেন তা রূপমতী ভাল করেই জানে।

বিটলাহা।

চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো বছর খানেক আগের একটি দৃশ্য।

বিটলা হওয়ার পর তিলে তিলে শুকিয়ে মরতে দেখেছে ও সেবাস্তিনার মাকে। পঞ্চায়েতের ভয়ে ওঁরাও মুণ্ডারাও কথা বলতো না, এক পয়সার তেল কি নুন কিনতে পেতো না শনিচারীর হাটে। অশ্লীল ঠাট্টা-বিদ্রূপ, নোংরা অঙ্গভঙ্গী করে তাকে পাগল করে তুলতো বারো বছরের বাচ্চাগুলোও। আর—

ভাবতেও শিউরে ওঠে রূপমতী।

জোয়ান বুড়ো সবাই ধরম অধরম ভুলে হল্লা বাধাতো তার ডেরায়, রাতে বিরেতে।

লাজশরমের বালাই ছিলো না লোকগুলোর।

তাই কারও দিকে চোখ তুলে তাকাতেও ভুলে গিয়েছিলো রূপমতী।

এক শুধু চুপচাপ দেখাশোনা লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে। দু'কুড়ি টাকা জমলেই চলে যাবে কুমাণ্ডির খাদানে। দু'জনে বাসা বাঁধবে সেখানে। বিটলার ভয়ে কাঁপতে হবে না।

তাই সন্ধ্যে পার না হতেই পট্টির পথ ধরতো ও, সাহস হতো না আগের মত ম্যাকুসাহেবের সঙ্গে রয়ে বসে রসিকতা করতে। মান্‌কির হুকুম না নিয়ে যেতো না আড্ডায়-আখড়ায়। কিন্তু ভিখারিয়ার ডুগডুগি উপেক্ষা করতে পারলো না ও। এসে হাজির হলো এই রামলীলার মাঠে।

ভিড় থেকে উঠে এসে সটান গিয়ে দাঁড়ালো ও মিঠাপানির দোকানটার সামনে। লাল নীল নানা রঙের বোতলে সস্তা লেমনেড আর চা বিস্কুট নিয়ে রীতিমত একটা দোকান বসে গেছে। আর কী আশ্চর্য, এই শীতেও যতো চাহিদা ওই দুর্লভ মিঠাপানির।

রূপমতী খাটো শাড়ির আঁচলে বাঁধা খুচরো পয়সা গুণতে গুণতে তাকালো এদিক ওদিক। অর্থাৎ পিয়াস গলার নয়, মনের। খুঁজছিলো লালোয়া কুড়ুখকে। ডুকেরী পাল্লার কাজ সেরে সটান এখানে চলে আসবার কথা তার!

আসবে ঠিকই, জানে রূপমতী। ভিখারিয়ার নাচ আর রূপমতীর নাম—দু-দুটো হাতছানি উপেক্ষা করার মতো ছাতির জোর লালোয়ার মত বাইশ বছরের সাওতার অন্তত নেই। তবু একটু অধীর না হয়ে পারে না ও। সাঁঝের 'আওয়াজ' শোনা যায় নি এখনও। ভয় সেটুকুই। কাজ শেষ করে হাতের শাবল নামিয়ে রেখে লালোয়াটা খাদানে বসেই গল্প শুরু করে দেয় কোনও কোনোদিন, ডিনামাইটের সাবধানী ঘন্টিটাও শুনতে পায় না। এমন এক ব্লাস্টিংয়ের সময়েই কয়লার সীম চাপা পড়ে মারা গেছে রূপমতীর আঠারো বছরের জোয়ান ভাই হরবন্‌শী।

এদিক ওদিক খুঁজে আবার গিয়ে আসরে বসলো রূপমতী। টের পেলো না ভিড়ের মধ্যে চুপচাপ বসে কোথায় লালোয়া কুড়ুখ এক মনে তোতা আর ময়োরের গান শুনছে। ভিড়ের গলায় গলা মিলিয়ে হো হো করে হেসে উঠছে থেকে থেকে।

ভিখারিয়া জমে উঠলো এদিকে। সন্ধ্যা নামলো। ঘন হলো অন্ধকার। আর মূল গায়েন থেকে সবাই এসে একে একে দেখা দিয়ে গেলো।

এদিকে রূপমতী, ওদিকে লালোয়া—নাটুয়াদের মুখে অপরের

কুৎসা শুনে দু'জনেই হাসছিলো হো হো করে। কিন্তু কে জানতো সে গানের ধুয়ো ঘুরে ঘুরে রূপমতীতে এসে ঠেকবে।

'বাঁশরিয়ার রূপমতী, মোতির মতো তার রূপ। ঝিনুকের ভেতর যেমন আড়াল থাকে মোতিয়া, তেমনি চুপছাপ মন রূপমতীর। গরিবে কুড়িয়ে পায়, তারপর হাতে হাতে ঘুরে রাজার আঙুলে গিয়ে শোভা পায় সে মোতিয়া। মনচুপছাপ রূপমতী হাতে হাতেই ঘুরছে এখন, কিন্তু মন জানে ওর রাজার হদিস।'

এত কাব্য করে বলবার লোক তো নয় ভিখারিয়ার নটুয়ারা। তাই গানটা কেমন যেন অসহ্য লাগলো লালোয়ার। অপেক্ষা করলো কেউ জবাব দেয় কিনা শোনবার জন্যে। কিন্তু সবাই শুধু হো হো করে হাসলো। এমন কি রূপমতী নিজেও। আর রাগ সামলাতে না পেরে হাতের কাছে একটা কয়লার চাঙড় পেয়ে সেটা ধাঁই করে ছুঁড়ে মারলো লালোয়া, গায়েনকে লক্ষ্য করে।

হৈ হৈ হট্টগোল। আসর সুদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে উঠলো উৎকণ্ঠায় আশঙ্কায়। একদল লাঠিসোটা নিয়ে তাড়া করলো গায়েনের দিকে। আরেক দল তাড়া করে এলো লালোয়া কুড়ুখকে।

ফার্নহোয়াইট, ডিক্‌সন, সাঠে আর সাহানার নেশা জমে উঠেছে তখন। কার হাত থেকে যেন গেলাসটা ছিটকে পড়লো ঝনঝন শব্দ করে। রঙিন চোখ চেয়ে ব্যাপারটা ঠাহর করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো সাঠে। টলতে টলতে দু'কদম এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো, ক্যা হুয়া? চিল্লাতা কাহে?

কেউ হয়তো শুনলো না তার কথা। উত্তর দিলো না কেউ।

রূপমতীও ভয়-কাঁপা চোখে তাকিয়ে দেখছিলো। কী করবে, কী করা উচিত কিছুই যেন ঠিক করতে পারলো না প্রথমটা। তারপর চোখজোড়া লালোয়ার মুখের উপর পড়তেই ভিড়ের দিকে ছুটে যাবার জন্যে পা বাড়ালো ও।

আর পরমুহূর্তেই থেমে পড়তে হলো।

কাঁধের ওপর ভারী হাতের অনুভব পেয়েই ফিরে তাকালো রূপমতী।

ফার্নহোয়াইটের ছেলে ম্যাকুসাহেব বললে, যাও মাৎ।

বলে রূপমতীর হাত ধরে ডাক দিলো, চলো ডেরামে ভাগ, চলো রূপমটি।

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো রূপমতী, পারলো না। অসহায় চোখ মেলে ও শুধু তাকালো ম্যাকুসাহেবের মুখের দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ভিড়টা যেন রূপমতীর দিকে ভেঙে পড়লো। লালোয়া কুড়ুখের ওপর যত রাগ, সব এসে পড়লো রূপমতীর ওপর।

পাপ যদি না করেছে তো রূপমতীর নামে ছড়া বাঁধবে কেন ভিখারিয়ারা, কুইলার চাঙর ছুঁড়বে কেন লালোয়া কুড়ুখ। ও হলো সান্তাল, সাথাসাথী কিসের এত লালোয়ার সঙ্গে। আসরটা ভাঙে দিবার তরেই তৈরী ছিলো কুড়ীটো। বলাবলি করলো সকলে।

বলে রূপমতীর দিকে ছুটে এলো দলটা। পাশ থেকে মরিয়ম ফিসফিস করে বললে, পালায় যা, তু পালায় যা রূপমতী।

আর ম্যাকু বললে, আও, চলে আও রূপমটি। বলেই ওর হাত ধরে টানতে টানতে অগ্নিকুণ্ড ছাড়িয়ে অন্ধকারে নেমে পড়লো।

নির্জন ফাঁকা মাঠের অন্ধকারে এসেই পা থেমে পড়লো রূপমতীর। অস্ফুটে বললে, লালোয়া, লালোয়ার কি হবেক সাহেব? পরমুহূর্তেই ম্যাকুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললে, আমি আছি ইখানে, লালোয়াকে তু বাঁচারে সাহেব! কান্না এলো যেন ওর গলা ঠেলে।

—ডরো মাৎ।

রূপমতীর পিঠে ভারী হাতখানা রেখে সান্ত্বনা দিলো ম্যাকু।

আর এই সময়েই বাতাস চিরে একটা বন্দুকের আওয়াজ হলো।

থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো রূপমতী। ম্যাকুসাহেবের চওড়া বুক টের পেলো ঝড়ো পায়রার ছটফটানি।

আশ্লেষ শিথিল করে ম্যাকু বললে, যাও রূপমটি। লালোয়া বাঁচেগা। বলেই আসরের দিকে ছুটতে শুরু করলো সে।

বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ডেরার দিকেই পা বাড়ালো রূপমতী।

লালোয়া বাঁচলো, কিন্তু ভিখারিয়াদের টাঙির ঘায়ে জখম হলো তার একখানা হাত। আর জখম হলো সান্তালপট্টির মান-ইজ্জত।

রূপ-ঝরানো ফুর্তি নিয়ে হাসি-হাসি মুখে হেলেদুলে বেড়াতো রূপমতী। ফার্নহোয়াইট বা ডিকসন্ হঠাৎ যদি বা কখনও খাদে নেমেছে কয়লার সীম পরীক্ষা করতে, কিংবা ওভারবার্ডেনের স্তূপ ডিঙিয়ে দেখতে গেছে ঠিকাদারের 'সাক্ষী'র নাপী ঠিক হয়েছে কিনা, তো মাথায় ঝুড়ি ফেলে বড়ো বড়ো চোখের কৌতুক আর কৌতূহল মেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে রূপমতী, সাহেবের মুখপানে চোখ এঁটে। শনিচারীর হাটে ছুড় কিনতে গিয়ে ফিরেছে রঙিন কাচের জলচুড়ি নয়তো গলার পুঁতিআঁটা হাঁসুলি পরে। কেউ সন্দেহ করে নি, দোষ দেখে নি কেউ। খাদানের রেজা, কদমে কদমে তার চোখ রাখলে চলে না। মন জুগিয়ে চললে তবেই ঘরে চালের জোগান আসে, সে খবর সবাই জানে। তা বলে এমন বে-আব্রু হয়ে ইজ্জত হারানো?

ভিখারিয়ার গায়েন কিনা ছড়া বাঁধলো রূপমতীর নামে? সান্তালপট্টির মান রইল কোথায় তা হলে?

বুড়া চুন্দু হাঁসদা পঞ্চায়েত ডাকলো। রূপমতীর বাপ মাধো

সোরেনকে। আর সে খবর দিয়ে গেল রূপমতীর সই সোনামিরু বললে, পঞ্চায়েত ডাকছে বুড়ো চুন্দু।

—ক্যানে? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো রূপমতী।

সোনামিরু হেসে বললে, ভিখারিয়ার রাতে ম্যাকুসাহেবর সঙ্গে পাপ কএরছিস, স্মরণ নাই তুয়ার?

—হুঁ। হাসলো রূপমতী। বললে, পঞ্চায়েত বসুক গিয়া। কাল চুন্দু বুড়ার ঘাড়ে বাক্‌টো ফেলার দিব, হুঁ।

কিন্তু ঘাড়ে বাকেট ফেলে দিয়ে চুন্দু বুড়োকে মেরে কী হবে, দুর্নাম রুখবে কে?

সারনাতলায় পঞ্চায়েত বসলো, আর পঞ্চায়েতের লোক এক কথায় বিচার দিলো।—বিটলাহা।

বিচার শুনে মাধো সোরেন ফিরলো মাঝরাতে। মেয়েকে ডাকলো কাঁদো কাঁদো গলায়।—রূপমতী।

—কি আপুং?

মাধোর চোখ সজল হলো।—পঞ্চায়েত বিটলার বিচার দেছে রূপমতী।

—বিটলা? হতাশ চোখ মেলে প্রশ্ন করলো রূপমতী।

—বিটলা? চমকে উঠলো ম্যাকুসাহেব খবরটা শুনে।

খাদানের কাজ সেরে ফেরবার সময় ম্যাকুকে খবরটা জানাতে গিয়েছিলো সোনামিরু।

সোনামিরু চোখ মুছে বললে, সায়েব, তুই পাপ কএরছিস, তু ইবার বাঁচা উয়ারে।

কিন্তু বাঁচাতে বললেই তো বাঁচানো যায় না।

দুটো টান দিয়েই সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো ম্যাকু। জেলেকনাইটের কাঠের বাক্সটা টেনে নিয়ে বসলো তার ওপর। আর টিপলারে যেখানে কয়লার স্তূপ জমেছে বাকেট

উল্টে উল্টে, সেদিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলো, কি করা উচিত।

তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো ম্যাকু। ধীরে ধীরে নিজেরই অজান্তে কখন পট্টির দিকে পা বাড়ালো। শুধু হুকুমই নয়, পাঁচ গাঁয়ের মানকি তখন পঞ্চাতের বিচার দিয়ে দিয়েছে।

ভিখারিয়ার গানই নয়, হৈ হল্লার সুযোগ নিয়ে রূপমতী ম্যাকু-সাহেবের সঙ্গে আঁধারে গা ঢাকা দিয়েছিল কেন, তা নাকি কারও বুঝতে বাকি নেই।

অতএব, বিটলা।

বিচার শুনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো রূপমতী। যে লোকগুলো এত ধরম অধরমের কথা বলছে, ও জানে এরাই এসে ইজ্জত কাড়বে ওর। ক্ষিদের যন্ত্রণায় কিংবা রোগে ভুগে ভুগে যখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে ও, তখনও দয়া মায়া দেখাবে না কেউ।

বিটলা! বিচার দিলো বড়ো পঞ্চায়েত। আর সঙ্গে সঙ্গে সারা গাঁয়ের ছেলে ছোকরারা দলে দলে বাঁশি আর মাদল বাজিয়ে নাচতে নাচতে ঘিরে ফেললো রূপমতীকে। আর তার পিছনে পিছনে আরেক দল এলো তীর-ধনুক উঁচিয়ে।

ঠাট্টা বিদ্রূপ হাসাহাসি। আর অশ্লীল গান। কেউ তীরের খোঁচা দিলো, কেউ টানলো তার শাড়ির আঁচল। আর মাঝে মাঝে *হৈ হৈ চিৎকার।*

বাচ্চা ছেলেগুলোও ছড়া কাটতে শুরু করলো। দু'হাত তুলে চিৎকার করতে করতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো রূপমতীর গায়ে।

এদিকে বাঁশ পোঁতা হলো রূপমতীর ডেরার সামনে। পোড়া কাঠ, পুরনো ঝাঁটা, আর ভাত খাওয়ার পর ফেলে দেওয়া শালপাতা গেঁথে দেওয়া হলো বাঁশের ডগায়। কেউ উনোন ভাঙলো, কেউ হাঁড়ি কড়াই টুকরো টুকরো করলো।

কিন্তু তারপর, তারপর পাড়ার মেয়েরা পালালো সেখান থেকে। যে যার ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করে দিলো, লজ্জাশরমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে।

লোকগুলোর কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী দেখে কিন্তু স্থির থাকতে পারলে না ম্যাকু। গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁতে দাঁত চেপে বললে, বীস্টস্।

যাকে সামনে পেলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো। তারপর শাড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিলো রূপমতীর গায়ে।

ম্যাকু সাহেবকে দেখে ভয়ে থেমে পড়লো সবাই।

গায়ে কাপড়টা কোন রকমে জড়িয়ে নিয়ে দাঁড়ালো রূপমতী। কপাল থেকে ঝর ঝর রক্ত পড়ছে তখন। সারা গায়ে কাদা।

ম্যাকু এগিয়ে এসে শক্ত করে ধরলো রূপমতীর একখানা হাত। তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তুললো বাংলোয়।

ফার্নহোয়াইট বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বিস্ময়ে কপালে ভ্রু তুলে তাকালেন। অর্থাৎ কি ব্যাপার?

বাউণ্ডুলে ম্যাকু এক মুখ হেসে বললে, মাই লেডী লাভ, মাই ওয়াইফ। তারপর বললো সব ঘটনাটা।

শুনে হাসলেন ফার্নহোয়াইট।—এ প্রাইজ ইণ্ডিড, এ প্রাইজ ফর ইওর *শিভাল্‌রি*। বলে সামনের টুল থেকে হুইস্কির গেলাসে আরেকটা চুমুক দিলেন।

কথাগুলো শুনলো, রূপমতী, কিন্তু বুঝলো না কিছুই। কৃতজ্ঞতার চোখ মেলে ও শুধু তাকালো ম্যাকুর দিকে, অপমান আর নির্যাতন থেকে যে ওকে বাঁচিয়েছে।

রাতটাও কাটলো ফার্নহোয়াইটের বাংলোতেই, যে বাংলোর কোণের ঘরে ওঁরাওদের খিস্টানী মেয়ে মেরিয়ার রাত কাটতো।

রূপমতীর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলো মেরিয়া।—সাহেবের বেটার নজর পড়ছে তুয়ার পরে, ডর নাইরে রূপমতী।

ডর নাই? যত ভয়ডর তো সেইজন্যেই। খাদানের কাজের ফাঁকে হাসি দিল্লাগী এক জিনিস, আর তার বাংলোয় রাত কাটানো অন্য। পীরিত ওর লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে। ঠিগিয়া হবে দু'কুড়ি টাকা জমলেই। তা নয়, ম্যাকুসাহেব হাসতে হাসতে এসে বলে কিনা রূপমতীকে সাদী করবে ও।

বেজাত খিস্টানের সঙ্গে সাদী? লালোয়াকে মুছে ফেলে ম্যাকুসাহেবের সঙ্গে মিতালী পাতাতে হবে?

মেরিয়া বোঝালো রূপমতীকে।—ম্যাকুসাহেবের বাপটা আমারে সুখে রাখছেরে রূপমতী, বেটাও সুখে রাখবেন তুযারে। বলছে বিয়া করবে বটে।

শুনে ভয়ে কাঁপলো রূপমতী।

শিকল ছিঁড়ে পালালো ফার্নহোয়াইটের বাংলো থেকে।

হোক্ বিটলা। পটই ভালো ওর। তবু তো লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে দেখা করতে পাবে লুকিয়ে। আর, আর বুড়ো বাপ মাধো সোরেন। তাকে ফেলে কিনা সুখের ঘর বাঁধবে রূপমতী?

অন্ধকারে শরীর লুকিয়ে ফিরে গেলো রূপমতী। পা টিপে টিপে ঝাঁপি সরালো. ঢুকলো ভেতরে।

মাধো সোরেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে তখন কাশছে খুক খুক করে। আর জ্বরের ঘোরে গোঙাচ্ছে থেকে থেকে।

রূপমতী ডাকলো ধীরে ধীরে।—আপুং।

—রূপমতী? চোখ খুললো মাধো।

রূপমতী এগিয়ে এলো কাছে, বাপের নির্বিকার মুখটার দিকে

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ও। দেখলো মাধো সোরেনের দু'চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

আশঙ্কায় আগ্রহে প্রশ্ন করলো, আহার পাইছোন না আপুং?

মাধো বিষণ্ণ হাসি হেসে মাথা নাড়লো।

তারপর ধীরে ধীরে সব কথা বলে গেলো মাধো। বিটলা হয়েছে রূপমতী। তাই মাধোর ঘুন্সিতে কড়ি থাকলেও দাম নেই তার। হাটের লোককেও জানিয়ে দিয়েছে পঞ্চায়েত। হুড়ু বেচবে না কেউ ওকে, সিম-সিমারি কিনবে না।

—পট্টির সকলে ডাইন বুলছে তুয়ারে। ডাইনীর বাপে ভূখা মরতে হবেক।

—সোনামিরু? আশায় আশায় প্রশ্ন করলো রূপমতী।

হাসলো মাধো। ধুমকুড়িয়ার মেয়ে বটে সোনা, পঞ্চায়েতের ডর নাই উয়ার?

দীর্ঘশ্বাস ফেললো রূপমতী। পঞ্চায়েতের ভয়ে সাহায্য তো দূরের কথা, দেখা হলে কথাও বলবে না কেউ, জিনিস বেচবে না দোকানী। শুধু বিদ্রূপ আর অত্যাচার। না পেয়ে তিলে তিলে মরতে হবে। সে সাংঘাতিক দৃশ্য দেখেছে রূপমতী।

তবু আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করলো। হয়তো লালোয়া কুড়ুখ আসবে, সব বিপদ থেকে তাকে বাঁচাবে।

কিন্তু লালোয়ার দেখা মিললো না। পঞ্চায়েতের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে আসতে সাহস পেলো না হয়তো।

শুধু সোনামিরু একদিন গভীর রাতে লুকিয়ে এসে খাবার রেখে গেলো। আর চাপা গলায় বলে গেলো, ইখান থেকে পালায় যা রূপমতী, তু পালায় যা। উয়ারা দল বাইন্ধা হামলা করবে তুয়ার পরে, আমি শুনছি।

ভয়-চাপা গলায় বললে সোনামিরু, ভয় বাড়িয়ে দিলো রূপমতীর।

কিন্তু কি করবে রূপমতী? কি করতে পারে?

সারা রাত বসে বসে ভাবলো ও। তবু বুড়ো বাপ মাধো সোরেনকে ফেলে যেতে মন চাইলো না।

পরের দিন সোনামিরুর কথাই ফললো। রাত না বাড়তেই রূপমতী হৈ হল্লা শুনতে পেলো। দল বেঁধে আসছে সবাই। ঝাঁপির ফাঁকে চোখ রেখে দেখলো রূপমতী। কুৎসিত উত্তেজনার হাসি চমকে উঠছে তাদের মুখে চোখে।

আর বুড়ো মাধো সেরেন নিঃশ্বাস চেপে ভয়ে ভয়ে বললো, পালায় যা রূপমতী, তু পালায় যা।

পিছনের ঝাঁপি খুলে পালালো রূপমতী। বুড়ো বাপের দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে ছুটে পালালো অন্ধকারে। ম্যাকুসাহেবের বাংলোর পথ ধরে।

ম্যাকুসাহেব ওকে বিয়ে করবে বলেছে, ম্যাকুসাহেব ওকে আশ্রয় দেবে।

ওঁরাওদের খিস্টানী মেয়ে মেরিয়া বলেছে, সাহেবের বেটার নজর পড়েছে তুয়ার পরে, ডর নাই-রে, সুখ্যে রাখবেন।

সব কানাকানি খেউর হল্লা চুপ হয়ে গেলো।

পঞ্চায়েত বললে, মানকির বিচার মিছা হয় না। পাপ কএরছিলো রূপমতী আখন পাপীর ঘরে ঠাঁই পায়েছে।

কোলিয়ারির কুলিকামিনরা বললে, বিটলাটো ঠিকই হইছে, কিন্তুক ডাইন ইবার হামাদের মজুরী কাটবেক। বুড়ো সাহেবের বেটার ঘরণী হঁয়েছে উ।

ম্যাকুসাহেবের ঘরনী হয়েছে রূপমতী, খবরটা শুনলো উঁচুতলার লোকরাও। ডিক্‌সন সিগারেটের টুকরোটা জুতোয় মাড়িয়ে বললে,

ন্যুইসেন্স। একটা সান্তাল গার্লকে কিনা বাংলোয় নিয়ে গিয়ে তুলতে দিলো ফার্নহোয়াইট ? মিশিরজী আর সাহানা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে হাসলো। অর্থাৎ বুড়ো নিজেই বা কম কি ! মেরিয়া ? কম্পাসবাবু চোখ কুঁচকে কি যেন ইঙ্গিত করলেন।

আর সোনামিরু এসে বসলো লালোয়া কুড়ুখের ক্লান্ত গাঁইতিটার পাশে। কোমরের গামছাটা খুলে পাখার মত নাড়তে নাড়তে বললে, জোয়ান মানুষটো তুই সায়েবের ডরে লুকায় থাকবি ?

দীর্ঘশ্বাস ফেললে লালোয়া। বললে, রূপমতীরে সমঝায়ে দেখ তুই, কুমাণ্ডির খাদানে কাম মিলবেক বটে, ধাওড়ায় ঘর মিলবেক। বিটলার ডর নাই।

সোনামিরু বললে, হুঁ, সমঝাবো রূরমতীরে। কিন্তুক তুয়ার দুইটো হাতে ঘর বাঁধবার হইল নাই, একটো হাতে কি ঘর বাঁধবারে পারবিন ?

কাটা হাতটার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসি হাসলো লালোয়া।

কিন্তু রূপমতী বুঝলো না।—লালোয়া ? শুনে খিলখিল করে হেসে উঠলো ও। বললে, ওটা মরদ বটেক না ধূমকুড়িয়ার কুড়ী ? বিটলার সুময় যাতে পারে নাই টাঙ্গি লিয়ে ?

শুনে আবাব দীর্ঘশ্বাস ফেলল লালোয়া। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে নিজেই গিয়ে হাজির হলো বাংলোর বাগানে।

ফার্নহোয়াইটের বাচ্চা মেয়েটার পেরাম্বুলেটর ঠেলছিল রূপমতী।

প্রথমটা চিনতে পারে নাই, ভাবছিলো আয়াটাকেই জিগ্যেস করবে রূপমতীর খবর। কিন্তু বাঁক ঘুরে রূপমতী সামনাসামনি হতেই সারা মুখ ম্লান হয়ে গেলো লালোয়ার।

মাজা ঘষা রূপ, তকতকে ফর্সা একখানা শাড়ি, চুলে যত্নের চাকচিক্য।

লালোয়া বললে যা বলবার। অনুনয়, অনুযোগ।

আর রূপমতী শুধু অসম্মতির ঘাড় নাড়লো।

—ম্যাকুসাহেব কি তুয়ার, ও কি বিয়া করবে সান্তাল কুড়ীকে ?

রূপমতী হাসলো। বললে, হুঁ। গির্জায় যায়ে খিস্টান হবো, ম্যাকুসাহেব বলেছে উ আমার হাসবাঁধ বটে।

সত্যিই হলো তাই। শুনলো কোলিয়ারির সবাই। সুন্দরগড়ের সাদা-আলখাল্লা পাদ্রী সাহেব বাইকে চেপে এসে হাজির হলো একদিন, ছোট গির্জার অল্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কি বলে গেল কিছুই বুঝলো না রূপমতী। শুধু বুঝলো ওর নতুন নাম হলো রেবেকা। রূপমতী থেকে হলো রেবেকা। সান্তাল থেকে খিস্টানী।

খুশিতে উছলে ওঠে রূপমতীর মন। পরের রবিবারেই ওদের বিয়া। তারপর ? তারপর ওকে রেবেকা মেমসাহেব বলবে সকলে। খাদানের কুলিকামিনরা। আর পঞ্চায়েতের যারা বিটলার জন্যে চিৎকার করেছিল তারাই সেলাম জানাবে দেখা হলে।

এ যেন হারানো ইজ্জত ফিরে পাওয়া। লালোয়ার সঙ্গে ঠিগিয়া হলে কি এ সম্মান পেতো ও। সারা জীবন শুধু ভয়ে ভয়ে কাটাতে হতো। কে কি কানাঘুষা করে, কে কি বিচার দেয়।

ম্যাকুর কাছে কতবারই তো শুনেছে ও, বিয়ের পর ম্যাকু হবে ওর হেরেল, স্বামী। খিস্টানী ভাষায় যাকে বলে হাসবাঁধ অর্থাৎ হাসব্যাণ্ড।

আমলকীর ঝিরঝিরে পাতার ফাঁকে ফাঁকে বাঁকা চাঁদের জ্যোৎস্নায় রূপমতী সব ভুলে গেলো। ভাবলো, সুখের জীবন বুঝি মোড নিলো এবার।

কিন্তু ভুল ভাবলো রূপমতী।

কোলিয়ারির চাকরি তো জুয়ার টাকা। আসতে যেতে সময় লাগে না। হিসেবের গলদ ধরা পড়লো, কোলকাতার অফিস জানালো ফার্নহোয়াইট বিদায় নিতে পারে চাকরি থেকে।

ফার্নহোয়াইট ছেলেকে ডেকে বললো, চাকরি যাক দুঃখ নেই।

দুঃখ শুধু টাকাগুলো ওড়ানোর জন্যে। তুমিও তো রোজগারের ধার দিয়ে গেলে না।

চুপ করে রইল ম্যাকু!

ফার্নহোয়াইট বললে, তল্পিতল্পা বাঁধতে হবে এবার। ভাবছি, বাঙ্গালোরে গিয়ে থাকবো, আর যদি চাকরি একটা পেয়ে যাই ভালোই।

—আমি? প্রশ্ন করলো ম্যাকু।

—হ্যাঁ, তোমার ব্যবস্থাও করেছি। তোমার বোন ডোরা এসে পৌছবে এই সপ্তাহেই। তার সঙ্গে আসছে পার্সিভালের মেয়ে সিলভিয়া।

—তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক?

ফার্নহোয়াইট হাসলেন।—তার যোগ্য হতে পারো তো পার্সি-ভাল নিশ্চয় একটা রেলের চাকরি তোমাকে দিতে পারবে।

—বিয়ে?

—কপালে চোখ তুলছো কেন? লাভ ইজ'ন্ট সামথিং ইম্পসিব ল?

মৃদু হেসে ফার্নহোয়াইট বললেন, রেবেকার কথা ভাবছো? ওটা কি বিয়ে নাকি? রোজগারের টাকাগুলো নষ্ট করেছি বটে, কিন্তু তোমার পাগলামির জন্যে দু'পাঁচশো টাকা খেসারত দেবার সঙ্গতি এখনও আছে।

শুনে কি একটা দাঁতে চিবোনো কটূক্তি করে সরে পড়লো ম্যাকু।

কিন্তু দিনকয়েক পরেই যখন ডোরার সঙ্গে সিলভিয়াও এসে পৌছঁলো, ম্যাকুর হঠাৎ মনে হলো বাপের কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। আর ফার্নহোয়াইট রূপমতীকে ডেকে বললেন, চৌকিদারের ঘরটা খালি আছে, কটা দিন এখানে থাকবে।

খুশী মনেই রাজী হলো রূপমতী। সত্যি তো। মেয়ে এসেছে, এসেছে মেয়ের সাথী। ও থাকলে বেমানান হবে বড়ো। আর অসুবিধেও হবে, হবে রূপমতীর নিজের।

সেই কথা বুঝিয়েই একদিন লরীতে মালপত্র তুললেন কার্নহোয়াইট। ডোরা আব সিলভিয়া আগেই চলে গিয়েছিলো। তাই বিদায়-মুহূর্তে রূপমতীর কান্নাঝরা চোখ মুছিয়ে দিলো ম্যাকু। বাপের চোখ এড়িয়ে নিজের চোখও মুছলো হয়তো।

বললে, ফিরে আসবো এক সপ্তাহের মধ্যেই। তারপর নিয়ে যাবো আমার রেবেকাকে।

সজল চোখে আনন্দের হাসি দেখা দিলো রূপমতীর।

যাবার সময় এক গোছা নোট গুঁজে দিলো ম্যাকু, রূপমতীর হাতে।

লরী ছেড়ে দিলো, পিছনে পিছনে কার্নহোয়াইটের ছোট মোটরখানাও।

কিন্তু ম্যাকু ফিরলো না আর।

কার্নহোয়াইটের জায়গায় মাস কয়েক পরে এলেন মিস্টার পেরেরা। এসেই বাবুর্চিকে বললেন, চৌকিদারের ঘর থেকে সাঁওতাল মেয়েটাকে তাড়াও।

টুকটুকে বাচ্চাকে বুকে আঁকড়ে চোখ রাঙালো রূপমতী। বললে, কে জানিস আমি? ম্যাকুসায়েব আমার হাসবাঁধ।

শুনে হাসলো বাবুর্চি, হাসলেন মিস্টার পেরেরা। মিশিরজী, সাহানা, কম্পাসবাবু সবাই হাসলেন। আর ঠাট্টা বিদ্রুপের ছড়া বাঁধলো সাঁওতাল পট্টির মেয়েপুরুষ।

হাসবাঁধ। সব বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়েছে ম্যাকু, তা কি এখনও বোঝেনি নাকি মেয়েটা?

হাসলো সবাই, হাসলো না শুধু একজন।

জাম্বোয়া বুড়োর।

গির্জার সামনের ঘরটায় যেখানে বাচ্চা কোলে নিয়ে উঠে আসতে হলো রূপমতীকে, সেখানেই ভীরু ভীরু চোখে উঁকি মারলো সে একদিন। রূপমতীর চাটাইয়ের এক কোণে ভয়ে ভয়ে বসলো লালোয়া। বললে, চল রূপমতী, ইখান থেকে কুমাণ্ডীর খাদানে চলে যাই।

চোখ রাঙালো আবার রূপমতী। বললে, পাপের কথা সাঁওতাল কুড়ীদের সাথে বলবি, আমি খিস্টানী বটি, পাপ করি না আমি। ম্যাকু সায়েব আমার হাসবাঁধ।

সোনামিরুও এলো একদিন দেখা করতে।

বললে, খাবি কি রূপমতী? খাদানে কাম নিবি তো চল, মুনশিরে বলি।

—খাদানের কাম? চোখ কপালে তুললো রূপমতী। বললে, আমার মা ম্যাকুসায়েবের সাথে বিয়া হইছে। ম্যাকুসায়েবের ইজ্জত খতম করতে চাস তুরা?

—ম্যাকুসায়েবের ইজ্জত? রাগে দাঁতে দাঁত চাপলো সোনামিরু। —উ আর ফিরবে নাইরে, উ আর ফিরবে নাই।

অবিশ্বাসের হাসি হাসলো রূপমতী।—ম্যাকুসায়েব মানুষটারে তুরা বুঝিস নাই বটে। ও আমারে কয়ে যেছে ফির্যা আসবে।

কিন্তু ফিরলো না ম্যাকুসায়েব। আর ম্যাকুসায়েবের ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে অনাহারে, অভাবে দারিদ্র্যে রূপ হারালো রূপমতী। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো তার।

লালোয়া, বুড়ুখ এলো একদিন। বসে গল্প করলো অনেকক্ষণ, অনুরোধ জানালো কুমাণ্ডির খাদানে যাবার। আর সে কথা হেসে উড়িয়ে দিলো রূপমতী। কিন্তু হাসি মুছে গেলো ক্রমশ তার মুখ থেকে। সত্যিই ফিরলো না ম্যাকু।

তবু ম্যাকুর বাচ্চাকে মানুষ করে তোলবার স্বপ্ন দেখলো রূপমতী।

এক-ইঁটের দেওয়াল দেওয়া দেহাতী গির্জার পশ্চিমের ছোট ঘরটায় চাটাইয়ে শুয়ে শুয়ে দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখলো।

ছেলে বড়ো হবে, খাদানের সাহেব হবে তার ছেলে। সোনামিরু বলে কি না খাদানে কাজ নিতে। নিজের মনেই হাসলো রূপমতী। সে হলো ম্যাকু সাহেবের মেম, ইজ্জত নাই তার ?

সুন্দরগড়ের সাদা আলখাল্লার পাদ্রী বাইক ঠেলে আসতো প্রতি রবিবার। বাইব‍ল্ পড়ার পর আর-আর খ্রিস্টানীদের সঙ্গে রূপমতীও সুর টেনে টেনে গাইতো প্রার্থনার গান, তারপর ইশু বোঙার কাছে বলতো, ম্যাকু সাহেবেরে তাড়াতাড়ি পাঠায় দে ইশু বোঙা। পাদ্রী যাবার সময় সান্ত্বনা জানিয়ে যেতো। কখনও বা ওঁরাও আর মুণ্ডা খ্রিস্টানীদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে দিয়ে যেতো রূপমতীকে।

সোনামিরুও আসতো মাঝে মাঝে। এনামেলের থালায় করে ঠাণ্ডি ভাত এনে রাখতো তার পাশে। বসতো, গল্প করতো।

আর বাইরের রাস্তায় গাড়ির শব্দ শুনলেই ছুটে আসতো রূপমতী। ওই বুঝি ম্যাকুসাহেবের গাড়ি এলো। একমুখ আশা-উজ্জ্বল হাসি নিয়ে ছুটে আসতো রাস্তা অবধি। তারপর মুখ কালো করে দীর্ঘশ্বাস বুকে পুষে ফিরে যেতো।

সোনামিরুকে বলতো, ফিরবো রে, ফিইরা আসবো। বেটার মুখ দেখবারে বাপ না ফিইরা পারবো ক্যানে।

লালোয়াও এসেছে কোনো কোনোদিন। সোনামিরুর সঙ্গে। আর ফেরার পথে ওরা বলাবলি করেছে, রূপমতীটো পাগল হইছে।

সোনামিরুও এসে জানিয়েছে, কাজ না করলে না খেয়ে মারা যাবে রূপমতী। বলেছে, মুনশিকে বলে কাম ঠিক্ করে দেবে।

আর রূপমতী হেসেছে সে-কথা শুনে। ম্যাকুসায়েবের ওড়াগমকে অর্থাৎ ঘরণী কিনা খাদে গিয়ে ঝুড়ি বইবে ? তাতে যে ম্যাকুসায়েবের ইজ্জত নষ্ট হবে।

এমনি করেই দিনের পর দিন কেটেছে। শেষে মৃত্যুও ঘনিয়ে এলো একদিন।

ছুপুরের ছুটির সাইরেন বাজার পর এনামেলের থালায় করে ঠাণ্ডা ভাত নিয়ে এসে সোনামিরু ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে উঠলো রূপমতীর বীভৎস চেহারা দেখে। এনামেলের থালাটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে রূপমতীর বুকের কাছ থেকে তুলে নিলো ফুটফুটে বাচ্চা ছেলেটাকে ! তারপর—

চাঁদা তুলে কবর দেওয়া হলো রূপমতীর। সুন্দরগড়ের সাদা আলখাল্লার পাদ্রী বাইক ঠেলে এলো আবার, বাইবল্ থেকে ছু' লাইন বিড় বিড় করে বলে গেলো।

কবরের নিস্তব্ধতায় নামিয়ে দেওয়া হলো রূপমতীর মৃতদেহ।

কবর নয়, মাটির ঢিবি। তার ওপর ছু' টুক্রো কাঠ আড়াআড়ি করে বেঁধে একটা ক্রশ পুঁতে দেওয়া হলো।

তারপর খিস্টান পল্লীর সবাই ভুলে গেল রূপমতীর কথা।

ভুললো না শুধু একজন। লালোয়া কুড়ুখ।

কারানপুরার কুলিকামিন, কোড়াকুড়ীরা বলে, প্রতিদিন সন্ধ্যায় এসে বসতো ও কবরের পাশে, ভয়ে ভয়ে হাত বোলাতো কবরের মাটির ওপর। চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে সে-মাটি ভিজে যেতো কোনো কোনোদিন। তারপর একসময় মাটির প্রদীপটা জ্বেলে দিয়ে চলে যেতো লালোয়া।

খিস্টান পল্লীর সান্তালরা বলে, লালোয়ার দেখাদেখি সোনামিরুও এসে বসতো কবরের পাশে। রূপমতীর ঘুম ভেঙ্গে যাবে এই ভয়ে একটাও কথা বলতো না সে। শুধু কোনো কোনোদিন প্রদীপটা

এগিয়ে দিতো নিজেই, কিংবা লালোয়ার হাত থেকে প্রদীপটা নিয়ে চকমকি ঠুকে ঠুকে নিজেই জ্বালাতো সেটা।

সাস্তাল পট্টির বুড়হা বুড়হির দল বলে—শালপাতার আড়াল-দেওয়া প্রদীপের শিখাটা জ্বলতো তারার মতো, দেখেছে তারা নিজের চোখে, প্রতিদিন দেখতে পেতো।

আর তা দেখে একে একে সান্তাল পল্লীর সবাই এসে বসতে শুরু করলো রূপমতীর কবরের পাশে ।

এসে চুপচাপ বসে থাকা, তারপর প্রদীপ জ্বালিয়ে ফিরে যাওয়া।

এ প্রদীপের শিখা সবাই দেখতে পেতো দূর থেকে।

ক্রমশ মুর্গী বলি শুরু হলো রূপমতীর কবরের পাশে, পৌষ পরবে নাচ শুরু হলো। ওঁরাও মুণ্ডা সান্তাল হো সবাই মিলে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিলো রূপমতীর কবর, আর সেই কবরের গায়ে নাম খোদাই করার সময় ঝগড়া বাধলো সাদা আর কালো খ্রিস্টানদের মধ্যে। কালো চামড়ার খ্রিস্টানরাই জিতলো শেষ অবধি। রূপমতী নয়, রেবেকা ফার্নহোয়াইট নয়, মাধো সোরেনের মেয়ে রেবেকা সোরেনের কবর।

বড়ো বড়ো হরফে পাথর খোদাই করে লেখা হলো রেবেকা সোরেনের নাম।

আজও কারনপুরার কোলিয়ারিতে রেবেকা সোরেনের কবর ঘিরে সারি সারি প্রদীপ জ্বলে। লালোয়া কুড়ুখের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবাই।

কিন্তু একটি নাম ডুবে গেছে বিস্মৃতির অতলে। নিবে গেছে শুধু একটি প্রদীপ। যে প্রদীপ শুধু লালোয়া কুড়ুখই জ্বালাতে পারতো। যে আলো জ্বলতো শুধু সোনামিরুর বুকে।

মুণ্ডা ধাওড়ার মেয়ে রূপমণিকে প্রথম যেদিন দেখেছিলাম, কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়েছিলো। আর ঝর্ণাটা দূর থেকে মনে হয়েছিলো, শাল আর শালাই গাছে আড়াল-পড়া কোনো পার্বত্য মন্দিরের চূড়ায় রূপোর পাত মোড়া রয়েছে।

ঝর্ণার জলস্রোত, পাথরের গায়ে বাধা পেয়ে যেখান থেকে উছলে পড়ছে, শুধু সেইটুকুই ভোরের সূর্যকিরণে চকচক করছিলো পালিশ করা রুপোর গম্বুজের মতো, বাকী গতিপথটা ঢাকা পড়েছিলো শাল আর শালাই গাছের আড়ালে।

আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথের দু-ধারে সাজানো শালের সারিকে দূর থেকে মনে হয়েছিলো দীর্ঘাকৃতি ঝাউবন, গুঁড়ির কটিদেশ থেকে ফুলে উঠে শাখা প্রশাখার রাশি শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হতে হতে এমনই নিখুঁতভাবে চূড়ার বিন্দুতে গিয়ে মিলেছে।

হরীতকীর বন আর খয়ের গাছের ঝোপ এড়িয়ে ঐ শালবনের ফাঁকে ফাঁকে উঁচুনীচু অসমতল পথ বেয়ে পাহড়ে উঠতে উঠতে যার সঙ্গে চোখাচোখি হলো, কে জানতো সেই মেয়েই মুণ্ডা ধাওড়ার মেয়ে রূপমণি।

চোখে চোখ পড়তেই ভীতত্রস্ত ভাব ফুটে উঠলো ওর মুখে। দ্বিতীয়বার অনুসন্ধানের দৃষ্টি ফেললো ও আমার মুখের ওপর, বুঝে নিলো আগন্তুক ফরেস্ট গার্ড নয়, কেড়ে নেবে না পাতার বোঝাটা, চড়চাপড় লাগাবে না, অরণ্য আইন ভাঙার জন্যে চাইবে না কোনো আরণ্যক ঘুষ। মুহূর্ত-কয়েক মাত্র। তারপরই পাহাড়ী

ঝর্ণার স্রোতে হাত ডুবিয়ে এক আঁজলা জল খেয়ে নিলো ও, পাতার বোঝাটা তুলে নিলো মাথায়। আর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তরতর করে নেমে গেলো দ্রুত পায়ে।

ও চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়লো। মনে হলো, মুণ্ডা ধাওড়ায় এমন মেয়ে তো দেখি নি কখনো। আরণ্যক সৌন্দর্যের একটা বিশেষ রূপ আছে জানতাম, কিন্তু তা যে এমন নিখুঁত যৌবন নিয়ে দেখা দিতে পারে, ধারণা ছিলো না। কিংবা কে জানে হয়তো পরিবেশ ওকে অতো সুন্দর করে তুলেছিলো।

কোলিয়ারির চাকরিতে সেটাই আমার প্রথম দিন। তখনও খাদ চিনি নি, টিপলার কাকে বলে জানতাম না, জলে ডোবানো এক নম্বর খাদটা দেখে ভেবেছিলাম কোনো প্রাকৃতিক হ্রদ।

ঊর্ধ্বকর্মী আলাপ করিয়ে দিতেই বললাম, কাজ বুঝিয়ে দিন মিশিরজী।

মিশিরজী বললেন, কাজ পরে হবে, পাঁচ নম্বরটা দেখে আসবেন চলুন। আর প্রভান্স খাতা এগিয়ে দিয়ে বললে, তারও আগে সইটা করে যান, অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেলে বৌ তবু কিছু টাকা পাবে।

বললাম, ও বস্তুটি এখনো সংগ্রহ করে উঠতে পারি নি ভাই।

মিশিরজী হাসলেন, সংগ্রহ হলেই বা লাভ কি হতো। এখানে ম্যানেজার থেকে মুন্‌শী সব ব্যাচেলার, বৌ ছেলে ফেলে এসেছে দেশে।

প্রভান্স কিছু একটা ইঙ্গিত করলে, হ্যাঁ, সব ব্যাচেলার, সাঙা সব

—সাণ্ডা আবার কি দ্রব্য ? বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম।

ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়, বোঝালেন মিশিরজী। 'সাণ্ডি' শব্দটার অর্থ 'পুরুষ,' তা থেকে 'সাণ্ডা পাল্লা। সরকারী আইন হয়ে গেছে রাতের শিফ্‌টে মেয়ে রেজাদের কাজ করানো যাবে না। তাই যে-সব কুলিদের মেয়ে 'জুড়ি' আছে তারা কাজ করে সকাল কিংবা বিকেলের শিফ্‌টে। রাতপাল্লায় কাজ করতে হয় না-জুড়ি মজুরদের। অর্থাৎ সাণ্ডিদের।

শুনছিলাম মিশিরজীর কথাগুলো, আর ধীরে ধীরে হলেজের ট্রলি-লাইন ধরে মন্থর পায়ে খাদে নামছিলাম।

আঁকাবাঁকা বিরাট একটা ব্যর্থ দীঘি। যতদূর চোখ যায় শুধু শাল শালাই, আমলকী আর মহুয়ার বন। তারও ওপারে পুবে পশ্চিমে একটি সুদীর্ঘ পাহাড়ের তরঙ্গ। আর এই শান্ত নিঃশব্দ অরণ্যের মাঝে বেনিয়া সিণ্ডিকেটের লুব্ধ কণ্ঠের চিৎকার ফুটে উঠছে হাজারো শাবল আর গাঁইতির কোলাহলে।

ধাপে ধাপে পৃথিবী যেন নেমে এসেছে নরকের অন্ধকারে। মাটির স্তর নেমে এসেছে অনেকখানি, তারপর একটা সিঁড়ির ধাপের মতো পাথর। তারপর কয়লা বলে ভুল হবার মতো কালো পাথর। নরকের সিঁড়ি শেষ হয়েছে কালো কয়লার অন্ধকারে। কোথাও মাটি, কোথাও বা পাথরের প্লটে কাজ চলছে। মালকাটারি রেজা-কুলিদের কলগুঞ্জন ভেসে আসছে খাদের গভীর থেকে। মাথা তুলে আকাশের দিকেই যেন তাকাতে হলো। লিলিপুটের মতো অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে মেয়ে পুরুষ। কুলিরা গাঁইতির পর গাঁইতি ফেলছে, ছন্দে বাঁধা ধীর পায়ে চলেছে সারি বাঁধা রেজাদের দল। খাড়াই পথ বেয়ে পিঁপড়ের সারির মতো চলেছে তারা, মাথায় পাথর বোঝাই ঝুড়ি, পুরুষদের বাঁকের দু-পাশে দড়ির ঝোড়া। খাদের একপাশে মাটি পথর ফেলে ফেলে নতুন একটা পাহাড় গড়ে তুলছে ওরা।

ভাবলাম, এই পাতাল-গভীরতায় যদি থাকে অরণ্যবাসী পুরুষের শক্তির স্বাক্ষর, তাহলে নতুন-গড়া পাহাড়টা সমর্থশরীর মেয়েদের স্বেদসাক্ষী। তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ সরে যেতে বললেন মিশিরজী।

দু-জোড়া ট্রলি-লাইন নেমে গেছে খাদের গভীরে। ওপরের হলেজ থেকে একটা মোটা তার নেমে এসেছে বাঁদিকের লাইনের মাঝখান দিয়ে, খাদ থেকে ফিরে গেছে তারটা ডান দিকের ট্রলি-লাইনের মাঝ বরাবর। রোপওয়ের টানে একটার পর একটা কয়লা-বোঝাই বাকেট উঠে আসছে, খালি বাকেট নেমে চলেছে সারি বেঁধে।

মিশিরজী বললেন, সরে চলুন, ক্লিপ খুলে যায় তো হুড়মুড় করে এসে পড়বে ওগুলো, খুঁজে পাওয়া যাবে না আর আপনাকে।

সরে যেতে গিয়ে পা পিছলে গেলো বালিতে, প্রভান্সকে ধরে সামলে নিলাম।

প্রভান্স হেসে বললে, আর ওদের দেখুন, কার্নিসে দাঁড়িয়ে পাথর কাটছে। এতোটুকু বে-টাল হলেই···

—সাওা পাল্লার কুলিদের কথাটা ভাবুন একবার। সারা বছর রাতের পর রাত···একে এখানকার বরফ-জমা শীত, তার ওপর অন্ধকারে এমন বিপজ্জনক কাজ!

বললাম, অন্যায়। আইন মেয়ে রেজাদের যতোটুকু বাঁচিয়েছে, না-জুড়ি কুলিদের মেরেছে তার বেশী।

প্রভান্স বললে, খাদে এখন আর-পাল্লার ডিউটি দিতে হয় না বটে মেয়েদের, তবে বাবুদের বাংলোয় এখনো···

—রূপমণির মতো তেজী মেয়েই ফণা গুটিয়ে নিলো। আফসোস করলেন মিশিরজী।

বিস্মিত হয়ে বললাম, রূপমণি কে?

—পাঁচ নম্বর খাদে যে নেমেছে একবার, রূপমণি কে তা

তাকে চিনিয়ে দিতে হয় না। গায়ের রঙ দেখলেই মালুম হবে, আর চোখ। লোকে বলে এক আর্মেনিয়ান ঠিকাদার ওর বাপ, আর মতান্তরে এ-কোলিয়ারির প্রথম ম্যানেজার ম্যাককিং সাহেবের ছেলে জোনাথন। বলে হাসলো প্রভান্স।

চিনিয়ে দিতে হয় না বলেই এপাশে ওপাশে তাকিয়ে খুঁজছিলাম রূপমণিকে। নতুন লোকটিকে বিস্মিত চোখে পরীক্ষা করে নিচ্ছিলো ওরা, কেউ মাথার ঝুড়ি কাঁধের বাঁক, কেউ বা শাবল গাঁইতি ফেলে রেখে ভাবছিলো নতুন বাবুটি কে বটেক।

মাঝে মাঝে থামছিলেন মিশিরজী, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। —নতুন হাজ্‌রিবাবু তোদের। বড়ো কড়া লোক, দেরি হলেই আধা-হাজ্‌রি।

—আও, দিনসকাল খাটবে আউর আধা-হাজ্‌রি করবে! ফোঁস করে উঠলো একটি মেয়েলী কণ্ঠ।

বহুক্ষণ থেকেই চোখে পড়ছিলো ও। রীতিবিরুদ্ধ একটি খাড়াই পথ বেয়ে ঝুড়ি মাথায় ওপরে উঠছিলো আর নেমে আসছিলো ও অনেক উঁচু থেকে। এরই ফাঁকে কখন অন্যমনস্ক হয়েছি আর ওর লিলিপুট চেহারা কাছে পৌঁছে গেছে, স্বাভাবিক রূপ নিয়েছে।

পাথরের গা থেকে জল পড়ছে চুঁয়ে চুঁয়ে, আর একটা জায়গায় ছোটো একটি গর্ত কেটে জল ধরে রেখেছে ওরা। রেজা কুলিরা মাঝে মাঝে তৃষ্ণা দূর করে আসছে সেই জলে। কালি-ঝুলি মাখা এই মেয়েটিকেও একটু আগে এক আঁজলা জল খেয়ে আসতে দেখেছি। ওর হাতের সেই ভঙ্গিমাটুকু ভালো লেগেছিলো, মনে হয়েছিলো এমন ভালো লাগার ছবি হয়তো বা আগেও দেখেছি।

কিন্তু চিনতে পারি নি প্রথমটা। আঁচলে মুখ মুছে নিলো ও, তারপর ঘাড়ের পিছনে দু-হাত রেখে কনুই দুটো পাখনার মতো নাড়তে নাড়তে বললে, জঙ্গলে ক্যানে গেলেন তুই ?

বললাম, তুই কেন গিয়েছিলি ? পাতা কেটে এনেছিস, বলে দেব গার্ডকে।

খিলখিল করে হেসে উঠলো ও, গলায় হারের মতো দোলানো টোকেন-চেনটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, খাদানে সব আগে চিনা হয়েছিস আমার, টিকিট ভুলে আলি হাজ্‌রি কাটবিন না বাবু।

মিশিরজী হেসে উঠলেন হো-হো করে। বললেন, বাংলা শিখে নিয়েছে রূপমণি, দেখেছেন ?

—তুই রূপমণি ? অজ্ঞাতেই মুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে কয়লা কাটছিলো একটা কুলি, এক চোখ ফিরে তাকিয়ে সে হাসলো।—রূপমণি নয়, খাদানের মণি। ধাওড়ার সেরা কুড়ী।

—আধাটা পরী, আধা লুবুড়ী। বললে বছর বারো বয়সের একটা বাচ্চা মেয়ে, মাথার খালি ঝুড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে।

অর্থাৎ অর্ধেক পরী, আর অর্ধেক ডাইনী।

বলেই ছুটে পালালো মেয়েটা, রূপমণি তাড়া করে গেলো তাকে।

ফিরে আসার পথে মিশিরজী বললেন, রূপমণিকে আপনি ভুলতে পারবেন না কোনোদিন। খাদের রানী ও।

রূপমণি তো দূরের কথা, তার টোকেন নম্বর যে দু-শো সাঁইত্রিশ তাও ভুল হতো না।

প্রতিদিনই তো আর দেখা হতো না ওর সঙ্গে, তবু এক্সপ্যাণ্ডেড মেটালের জাল-জানালার ওপাশে শুধু হাতখানা দেখেই চিনতে পরাতাম।

—সর্দারের নাম ?

—গোপী সিং।

—তোর নাম ?

—রূপমণি।

—চাকতির নম্বর ?

—দু-শো সাঁইত্রিশ।

এ রীতি আর সকলের ক্ষেত্রে ঘটতো। কিন্তু এমন সওয়াল-জবাবের হাজ্‌রি রূপমণিকে শুধু প্রথম দিনই করতে হয়েছিলো।

সাত দিন অন্তর কাজের শিফ্‌ট বদলে যেতো ওর। আমারও তাই। মাসে সাত দিন, বড়ো-জোর পনেরো দিন দেখা হতো ওর সঙ্গে।

খাদের মুখে ছোট্টো একখানা গুমটি ঘর, অ্যাটেনডেন্স ক্লার্কের আপিস। এক কোণে একটা জলের কুঁজো, জাল-জানালার সামনে তেপায়া একটা ভাঙা টেবিলে একরাশ বড়ো বড়ো হাজ্‌রি খাতা, আর জেলেকনাইট-জেলেটিনের একটা প্যাকিং বাক্স হাজ্‌রেবাবুর কুর্সির কাজ করতো।

কুলিকামিনরা হাসাহাসি করে বলতো, বাস্‌কাটো হাটায় দে বাবু, উটা মেজাজ গরম করে দেয় তোর।

দুপুর বারোটায় আর সন্ধ্যে ছ-টায় যখন 'আওয়াজ' হয়, পাথরের গায়ে বোরিং করে ডিনামাইট দিয়ে প্লট পাথর ফাটানো হয়, তখন এই কাঠের বাক্স থেকে সাদা সাদা পাউডার ছড়িয়ে দিতে দেখেছে ওরা। যার ছোঁয়া লেগে পাথরই গরম হয়ে ফেটে গুঁড়ো হয়ে যায়, তার বাক্সে বসলে বাবুর মেজাজ গরম হয়ে উঠবে এ আর বেশী কথা কি!

রূপমণি কিন্তু ওসবের পরোয়া করতো না। সামনে এসে দাঁড়াতো, চোখাচোখি হলেই এক মুখ হেসে মুখে আঁচল চাপা দিতো। কিছুই জিজ্ঞেস করতাম না। গোপী সিং সর্দারের পাতাটা খুলে হাজ্‌রি করে নিতাম ওর। কিন্তু পিছনে ভিড় জমে গেলেও সরতে চাইতো না ও, আজেবাজে কথার পর কথা বলে যেতো।

খাদে নামতাম যেদিন কোনো বিশেষ কাজে, সেদিনও মাথার ঝুড়ি ফেলে রেখে কাছে এসে দাঁড়াতো ও। দেখাতো হাটে কি রঙিন কাচের জলচুড়ি কিনেছে, কিংবা কানে গড়িয়েছে কোন রুপোর ঝিকাচিল্লি।

—কেমন হয়েছে বল্ বাবু, দাম বেশী নিয়েছে ?

কোনোদিন হয়তো বলতাম, বাঃ! বেশ মানিয়েছে, খোঁপায় একটা ফিতে বাঁধ এবার।

—আও! ফোঁস করে উঠতো, রূপমণি। বলতো, মাথায় ফিঁতান বান্ধে ঐ কিস্তান মেয়েরা। মড়িয়াম, সেবাস্তিনা মেরী—ওরা ফিঁতান বান্ধে।

ওর গলায় সাতনরী পুঁতির হারটা দেখিয়ে বলতাম, তবে এটাকে বিদেয় দিয়ে একটা রুপোর হাঁসুলি বানা।

—উঁহুঁ। ও বাপ্‌লার পর আমার ঠিগিয়া আদমিটা দেবেক।

—বিয়ে কবে তোর ? ঠিগিয়াটাই বা কে ?

—পরিয়াগকে দেখিস নাই আপুনি ? সাও পাল্লার মালকাটারি বটেক।

শনিচারীর হাটেও মাঝে মাঝে দেখা হতো ওর সঙ্গে। কখনো এটা-ওটা কিনতে আসতো, কখনো তরিতরকারি, সিমসিমারি, অর্থাৎ মুর্গি আর ডিম বেচতে আসতো। তুটো ডিম হাতে দিয়ে বলতো লিয়ে যা বাবু, দাম দিতে হবেক নাই। কোনোদিন বা বলতো, তিন সের বিলাইতি আছে বেচে দে বাবু, বিলাসপুরীরা দেখলে লুঠ করে লেবেক। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বেচে দিতাম টমাটোগুলো, পয়সা আদায় করে দিতাম ঠিক ঠিক।

এমনিভাবে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিলো রূপমণি! বুঝতাম, আর পাঁচজনের চোখে লাগছে, আড়ালে কানাঘুষো করছে অনেকে। ভবাতাম, এবার যদি এসে গায়ে-পড়া ভাব দেখায় কিংবা অমন

ভঙ্গিমায় শরীর দুলিয়ে কথা বলে, কড়া করে ধমক দেবো। কিন্তু কাছে এলে আপনা থেকেই কেমন যেন মনটা নরম হয়ে যেতো।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, অনুরোধ থেকে দাবিতে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু দাবিটাও উপেক্ষা করতে পারলাম না।

বললে, দুটো টাকা দে বাবু।

—কেন? আজ তো শনিবার, হপ্তার মজুরি পেয়েছিস তো?

জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু জিজ্ঞেস করার আগে পকেটে হাত ঢুকলো।

ঠোঁট বাঁকালে রূপমণি।

—মজুরি? ছ টাকা পেলেন আমি, সাত টাকা পাঞ্জাবীর সুদ লাগবেক।

চুপ করে থাকতে দেখে রূপমণি বললে, দে বাবু দে, দশ পয়সা সুদ দোব তোকে হপ্তায়।

—পাঞ্জাবীরা কত নেয়? জিজ্ঞেস করলাম।

—হপ্তায় টাকায় দু আনা লেবে। তিন টাকা লিয়েছিলি পরবের সময়, চল্লিশ টাকা দিয়া হইছে। সুদ বাকী পড়ে সাত টাকা সুদ হইছে।

—খেতে পাস কি তাহলে?

রূপমণির গলা ভার হয়ে এলো, চোখ ছলছল করে উঠলো। —কি করি বল, টাকা না দিলে পাঞ্জাবীরা বেইজ্জত করে। পঞ্চায়েতকে দুটো মুর্গি আর এক হাঁড়ি মাণ্ডি দিয়ে পাপ ধুয়ে লিয়েছি, আর পাপ করবোন না বাবু।

—না খেয়ে সুদ গুনবি শুধু?

বিষণ্ণ হাসি হাসলে রূপমণি।—পাঞ্জাবীরা রাজা লোক, টাকা করজ করেছি, ধাওড়ার লোক আমাকেই দুষী বলবেক।

হয়তো চেষ্টা করলে দুটো টাকাই দিতে পারতাম, তবু কেন জানি না, একটা টাকা দিয়েই বিদেয় করলাম।

ঠিক পরের সপ্তাহে দশটা পয়সা এনে দিলো রূপমণি।

বললাম, সুদ দিতে হবে না, যখন পারবি ফেরত দিস।

ভাবলাম, হাজ্‌রির কুলি অনুপস্থিত থাকলে বে-হাজ্‌রি কুলিকে সেই টোকেনে কাজ করতে দেবার জন্যে ঠিকাদারের কাছ থেকে তো রীতিমতো ঘুষ খাচ্ছি, এটুকু দয়া দেখালামই বা।

রূপমণি হেসে বললে, যা দিচ্ছি লিয়ে লে তুই, টাকা আর ফেরত হবে নাই।

বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

—চাকতি নম্বর কাড়ে লিয়েছে সর্দার।

তারপর একে একে ব্যাপারটা বর্ণনা করে গেলো রূপমণি। দুপুর বারোটার সময় দুটো ঝুড়ি আর একটা শাবল নিয়ে গোপী সিং তার ডেরায় পৌঁছে দিতে বলেছিলো রূপমণিকে। যায় নি রূপমণি! তাই কাজ থেকে বরখাস্ত হয়ে গেছে সে।

বললাম, দোষ তো তোরই, কাজ না করলে চটবে না?

রূপমণি ধমক দিয়ে উঠলো যেন। বললে, এতোদিন হলো হালচাল বুঝলিন না তুই। এতোগুলান কুলি থাকতে রেজাদের ডেরায় যেতে বলে ক্যানে? আর সকল কুড়ীরা যাক্‌, আমি যাবো নাই।

সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। বললাম, ভাবিস না, চাকরি থাকবে তোর। আমি ব্যবস্থা করবো।

ঠিকাদার উপাধ্যায়কে এসে বললাম, আপনার মুন্‌শী গোপী সিং রূপমণির টোকেন কেড়ে নিয়েছে, ওকে কাজে বহাল রাখতে হবে।

উপাধ্যায় হাসলেন।—ওদিকে চোখ দিলে কোলিয়ারির কাজ চলে না বাবুজী। চোর লম্পট জুয়াড়ী, তিন নিয়ে কোলিয়ারি।

তা বলে এমন অনাচার সহ্য করে যেতে হবে ?

উপাধ্যায় বললেন, বাবুজী, গোপী সিংয়ের মতো মুন্‌শী না থাকলে ঠিকাদারী বন্ধ হয়ে যাবে আমার। আর রূপমণিকে বহাল রাখলে গোপী সিং ইস্তফা দেবে।

উপাধ্যায়ের কথা শুনে জ্বালা ধরে গেলো সমস্ত শরীরে ; কথা যখন দিয়েছি রূপমণিকে, ব্যবস্থা একটা করতে হবেই। কিন্তু উপায় ভাবতে গিয়ে দেখলাম মিথ্যে ভরসা দিয়েছি রূপমণিকে।

শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী সুধীনবাবু হাসলেন।—উপাধ্যায়জী আমাদের প্রেসিডেন্ট।

অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার চোখ কুঁচকে বললেন, আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, শী-ল বি সেফ হিয়ার। আর সারাদিন খেটে যা পায় তার বেশিই পাবে। কাজ আর কি ঘর-দোর সাফ করবে মাঝে মাঝে, আর মালীর ঘরটা খালি পড়ে আছে ওখানেই থাকবে।

বেরিয়ে এসে মনে হলো জীবনে এমন অসহায় কখনো মনে হয় নি

আর একটাই পথ, একটাই মাত্র উপায় আছে। কিন্তু তাও কি সম্ভব ?

আর পাঁচজনের চোখ এড়িয়ে মুণ্ডা ধাওড়ায় গিয়ে হাজির হলাম। ডেকে তুললাম পরিয়াগকে।

বললাম, কাল সকাল থেকে ওয়াগন লাগবে রেল-সাইডিংয়ে। পুরো দমে কাজ চলবে আজ রাত্তিরে। কিন্তু কাজ রাখতে হবে সাণ্ডা পাল্লায়, যতোক্ষণ না রূপমণি কাজে বহাল হয়।

উত্তেজিত করবার যতো রকমের কৌশল জানা ছিলো সব ক-টা একে একে প্রয়োগ করলাম।

বললাম, পরিয়াগ, তুই চেষ্টা করলে হবে, শুধু আমি এর মধ্যে আছি জানতে দিবি না।

পরিয়াগ চুপচাপ শুনলে কথাগুলো, কোনো কথা বললে না। শুধু মাথা কাত করে সায় দিলো, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

চলে এলাম।

রাত দশটার সময় খবর পেলাম, খাদে কি একটা গোলমাল হয়েছে, কাজ করছে না কেউ। তিরিশটা ওয়াগন ফিরে যাবে কাল সকালে, আবার কবে ওয়াগন মিলবে ঠিক নেই। এদিকে টিপলারেও আর জায়গা নেই কয়লা স্টক করবার।

ছুটোছুটি গুঞ্জন শোনা গেলো কিছুক্ষণ। উপাধ্যায় আর সুধীনবাবু উত্তেজিত ভাবে কি যেন বলতে বলতে ছুটে গেলেন। তারপর সব চুপচাপ।

রাত বারোটায় ভোঁ বাজলো দূরের অন্য কোলিয়ারিতে। চঞ্চল হয়ে উঠলাম। কোনো খবর নেই, কোনো শব্দ নেই।

কি ফল হয়েছে জানবার জন্য উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে।

অন্ধকার রাত। দূরের টিপলারে শুধু গোটা কয়েক আলো জ্বলছে। আর শীতরাতের ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস। মাথায় উলের বাঁদুরে টুপি আর পায়ে মোজা এঁটে বেরিয়ে এলাম। খবর না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

হাতে টর্চ নিয়ে পিছনের পথ দিয়ে এগিয়ে গেলাম খাদের দিকে। টিলাটার কাছ থেকে বেবি-ক্রেশ অবধি একটা পাহাড়ী সাপ গাছের গুঁড়ির মত মাঝে মাঝে পথ আটকে পড়ে থাকে জেনেও বিচলিত হলাম না। ভয়ের চেয়ে আগ্রহ বেশী হলে হয়তো সাহস বেড়ে যায়। তাই।

কিন্তু খাদের পাড় থেকে উঁকি মেরে দেখে হতাশ হলাম। দিব্যি কাজ চলছে। হ্যাঁ, পরিয়াগও এক মনে গাঁইতির পর গাঁইতি

চালিয়ে যাচ্ছে। এতো উঁচু থেকে দেখেও পরিয়াগকে চিনতে ভুল হলো না।

রোপ-ওয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। খোলার ছাদে বৃষ্টি পড়ার মতো ঝিরঝির ঝিরঝির শব্দ হচ্ছে। মালবোঝাই বাকেটগুলো সারি বেঁধে চলেছে রোপ-ওয়েতে ঝুলতে ঝুলতে।

পরের দিন জানতে পারলাম ব্যাপারটা।

খাস ম্যানেজার ডেকে পাঠিয়ে বললেন, চাকরি তো যাবেই, তার চেয়ে রেজিগনেশন দিয়ে দিন। আর সশরীরে যদি বাঁচতে চান, সরে পড়ুন এখান থেকে।

পরিয়াগকে বললাম, এমন নেমকহারাম তুই? নামটা বলে দিলি?

আমি? বিস্ময়ে কপালে চোখ তুললো পরিয়াগ।—না বাবু, রূপমণি বলে দিয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, সাওা পাল্লায় আমাদের সামনে এসে রূপমণি বললে, ওর গুণা হয়েছে, গোপী সিংয়ের দোষ নাই।

বললাম, তবে? আমাকে কেন বললে ও কথা?

বিষণ্ণ হাসি হাসলে পরিয়াগ।—গোপী সিং ওকে নতুন শাড়ি দিয়েছে বাবু, রূপমণি ওর ডেরাতেই থাকবে।

দুপুরের শিফটে দেখা হলো রূপমণির সঙ্গে। নতুন শাড়ি পরে হেলেদুলে এসে দাঁড়ালো সামনে।

বললাম, শরম নেই তোর?

লজ্জায় মাথা নিচু করলে রূপমণি। তারপর ধীরে ধীরে বললে, মুন্‌শীর কতো তাকত বাবু, ঠিকাদার মনেজার সকলে ওর কথা শুনে। মুন্‌শী চটলে খাবো কি বল্‌?

রাগে ঘৃণায় চলে এলাম কোনো উত্তর না দিয়ে।

মিশিরজী পিছন থেকে এসে কখন কাঁধে হাত দিয়ে বললেন,

ভাববেন না বাবুজী। লেখাপড়া করেছেন, অন্য কোলিয়ারিতে চাকরি পেয়ে যাবেন।

বললাম, জানি। কিন্তু রূপমণির ব্যাপারটা বুঝলাম না মিশিরজী।

মিশিরজী হাসলেন।—দোষ নেই ওর, ওকে মাফ করবেন আপনি। এ না করলে পরিয়াগকে বাঁচাতে পারতো না ও। ঠিক হয়েছিলো আঠারো নম্বর প্লটে পরিয়াগকে পাঠিয়ে দিয়ে বিনা ওয়ার্নিংয়ে ডিনামাইট ব্লাস্ট করানোর।

চুপ করে থাকতে দেখে মিশিরজী আবার বললেন, আপনার এতো মাথাব্যথা কেন প্রশ্ন করাতেই সাওতারা হাসাহাসি করেছিলো, লজ্জায় মাথা নুয়ে গিয়েছিলো পরিয়াগের। তাই পরিয়াগকে লজ্জা থেকে রেহাই দেবার জন্যেই আপনার নাম বলে দিয়েছে রূপমণি।

শুধু প্রভান্স বললে, কে জানে, হয়তো আপনারই দুর্নাম বাঁচাবার জন্যে।

ঝাঁসী হয়ে ভূপাল যাবার পথে ভীলসা স্টেশন। স্টেশন থেকে নেমে পশ্চিমের পথ ধরে এক্কা ছুটবে। তারপর বেতুয়া নদী পার হয়ে পৌঁছতে হবে বেশনগরে। বেশনগরের 'খাম্বাবা' এবং তার দু-ক্রোশ দক্ষিণের উদয়গিরি প্রাচীন শিল্পভাস্কর্যই নয়, একটি রোমাঞ্চময় অতীত ইতিহাসকেও স্মরণ করিয়ে দেয়।

গোয়ালিয়র রাজ্যের এই নগরের সন্নিকটেই ছিল প্রাচীন মালোয়া রাজ্যের রাজধানী, এই বেশনগরের দু-দিক থেকে প্রবাহিত হতো বেতুয়া ও ব্যাস-নদীর বিদ্যুৎস্রোত জলধারা। মালোয়ার রাজধানী এই বেশনগরেই ছিল বাসুদেবের মন্দির।

স্থানীয় গাইড এই মন্দির-প্রাঙ্গণের একটি সুদীর্ঘ স্তম্ভের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলে, এ হ্যায় খাম্বাবা।

—খাম্বাবা ?

প্রশ্নের উত্তরে সে জানালে, এই খাম্বাবা আসলে গ্রীক রাজপুত্র হেলিওডোরাসের তৈরী গরুড়স্তম্ভ। একটি ভারতীয় নারীর সঙ্গে এক গ্রীক যুবকের প্রণয়-কাহিনী লুকিয়ে আছে এই স্তম্ভের আড়ালে, এই বাসুদেব-প্রাঙ্গণের নিঃশব্দ বাতাসে ফিসফিস করে কে যেন কানের পাশে কূজন করে যায় অতীতের এক যবন যুবক আর এক মালোয়া রাজকন্যার প্রেমের উপাখ্যান।

খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০ অব্দে এই স্তম্ভ তৈরী করিয়েছিলেন হেলিওডোরাস, স্তম্ভগাত্রে ব্রাহ্মী হরফে তা কীর্তিত হয়ে আছে। 'পরম ভাগবত'

উপাধি-ভূষিত তদানীং গ্রীক রাজপুত্র হেলিওডোরাসের পরিণয়-কাহিনী অপূর্ব একটি প্রেমের উপাখ্যান।

তক্ষশীলায় রাজত্ব করছেন তখন গ্রীকরাজ এন্টিসিলিওডিরাস। মালোয়া তখন এক সমৃদ্ধিশালী স্বাধীন রাজ্য।

এন্টিসিলিওডিরাস তাঁর রাজ্যকে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যে আদেশ দিলেন একটি সহস্রকুঞ্জর বাহিনী গঠন করবার। কিন্তু তক্ষশীলার অরণ্যে তো হাতির হদিস মিলবে না। এন্টিসিলিওডিরাস বুঝলেন, গজবাহিনী গড়ে তুলতে হলে মালোয়ারাজ্যের সাহায্য প্রয়োজন। কারণ মালোয়ার অরণ্যই তখন পশ্চিম ভারতের প্রায় সব রাজ্যকে হাতি সরবরাহ করতো।

তাই মালোয়ারাজের কাছে বাণিজ্য-সন্ধির শর্ত পাঠালেন এন্টিসিলিওডিরাস। মালোয়ারাজ জানালেন, তিনি সন্ধিশর্তে আবদ্ধ হবেন যদি গ্রীকরাজ পরিবর্তে মালোয়া রাজপুত্রকে গ্রীক রণকৌশল শিক্ষা দেন।

শর্ত গ্রহণ করলেন এন্টিসিলিওডিরাস। মালোয়া রাজপুত্র এসে উপস্থিত হলেন তক্ষশীলায়। গ্রীকরাজ সাদর অভ্যর্থনা জানালেন যুবরাজকে, রাজবংশীয় ডিওনের ওপর ভার দিলেন অতিথিপরিচর্যার। এই রাজবংশোদ্ভূত ডিওনের পুত্রই হেলিওডোরাস।

শ্বেতকেশ ডিওন তাঁর পুত্রকে উপস্থিত করলেন মালোয়া যুবরাজের কাছে। বললেন, আজ থেকে তোমরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের সৌহার্দ্য যেন মালোয়া এবং তক্ষশীলাকেও বন্ধুত্বের পাশে আবদ্ধ রাখতে পারে চিরকাল।

হেলিওডোরাস আর মালোয়া যুবরাজ—প্রত্যুষে পাহাড়ী পথ বেয়ে দুই সুপুরুষ সুদর্শন যুবক ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে—প্রজারা দূর থেকে দেখেই চিনতে পারতো এই ভারতীয় আর গ্রীক যুবক দুটিকে। মধ্যাহ্নের অক্ষক্রীড়া, নিশীথের গল্পগুঞ্জনে মেতে থাকতো দুই ভিন্নদেশী বন্ধু।

এইভাবেই সুখে স্বপ্নে দিন কেটে যায় মালোয়া রাজপুত্রের।

মালোয়ার উষ্ণ আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে মালোয়া রাজপুত্র। কিন্তু তক্ষশীলা শীতপ্রধান রাজ্য।

পাহাড়ী ঝরনার গা বেয়ে দুই বন্ধু একদিন পরিভ্রমণ করতে করতে দেখতে পেলো পর্বতচূড়া থেকে তুষার গলে গলে পড়ছে। তুষারের মুকুটে ভূষিত পর্বতশৃঙ্গে ঠিকরে পড়ছে সূর্যের সোনালী রশ্মি। সে-দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হল মালোয়া রাজপুত্র।

বললে, চলো বন্ধু, এই তুষার-গলে-পড়া সলিলে সন্তরণ করে আসি।

হেলিওডোরাস বাধা দিলো বললে ঃ না বন্ধু। এর রূপে আকৃষ্ট হওয়া এক, এর সলিলস্রোতে স্নান করা অন্য। তুমি উষ্ণপ্রধান দেশের রাজপুত্র, এই শীতল জলধারা তোমার পক্ষে ক্ষতিকর।

তা সত্ত্বেও নিষেধ শুনলো না, হেলিওডোরাসের কথায় সশব্দে হেসে উঠে ঝরনার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো মালোয়া রাজপুত্র।

তারপর জ্বরবিকার, জীবনসংশয়।

ডিওনের প্রাসাদকক্ষে প্রায় মৃত্যুশয্যায় পড়ে আছে মালোয়া রাজকুমার। হেলিওডোরাস, ডিওন, ডিওনের পত্নী সযত্নে সেবা শুশ্রূষা করে চলেন বিদেশী রাজপুত্রের। দেবতার পায়ে প্রার্থনা জানান ডিওন-পত্নী, আমার পুত্রের জীবন দান করো প্রভু।

হয়তো ডিওন-পত্নীর প্রার্থনা শুনতে পেলেন দেবতা। মালোয়া রাজপুত্রের রোগ আরোগ্য হলো।

বন্ধুর মাতাকে প্রণাম জানিয়ে কৃতজ্ঞতা জানালো মালোয়া রাজপুত্র।

মৃদু হাসলেন ডিওন-পত্নী।

বললেন, আমার পুত্রের বন্ধুও আমার পুত্রতুল্য। তোমাকে আমি সন্তান-রূপেই দেখেছি বৎস।

মুগ্ধ হলো মালোয়া রাজকুমার। গ্রীকরাজকে অনুরোধ জানালো হেলিওডোরাসকে মালোয়ার দূত নিযুক্ত করবার জন্য।

মালোয়ারাজ পুত্রের চিঠিতে জানতে পারলেন নবনিযুক্ত দূত হেলিওডোরাস তাঁর পুত্রের বন্ধু, তারই মাতার সেবাযত্নে প্রাণ লাভ করেছে তাঁর পুত্র।

তাই যুবক হেলিওডোরাস মালোয়ার দরবারে উপস্থিত হতেই সম্রাট বললেন, বিদেশী যুবক, আজ থেকে তুমি আমারও পুত্র। আমার পরিবারের সন্তান তুমি।

রাজপরিবারে রাজপত্নীর স্নেহসিঞ্চনে দিন কেটে চলে হেলিওডোরাসের। মাঝে মাঝে রঙিন স্বপ্নের মতো একটি সুন্দর লজ্জারুণ মুখ উঁকি দিয়ে সরে যায় যবনিকার অন্তরালে।

দাসীদের কাছে এই রাজকুমারীর কথা শুনতে পায় হেলিওডোরাস। ক্ষণিক রোমাঞ্চের চোখে বিদ্যুতের মতো সে রূপ দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়।

হেলিওডোরাস দরবারে যায়, কখনো মালোয়া পরিভ্রমণে বের হয়, আর ফিরে এসে দেখতে পায় একটি পুষ্পমাল্য তার দ্বারপ্রান্তে পড়ে আছে। কৌতূহল বোধ করে গ্রীক যুবক, মনে আনন্দের গুঞ্জরন ওঠে।

তার মনে রূপবতী রাজকন্যার কটাক্ষমধুর হাসি যে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে, রাজকন্যার মনেও কি জ্বলছে সেই একই শিখা?

না শুধুই কৌতুক? বিদেশিনীর রহস্যঘেরা অভিনয়?

এমনি ভাবেই দিনের পর দিন কেটে চলে। বসন্ত উৎসবের কাল ঘনিয়ে আসে।

সারা মালোয়া রাজ্য পুষ্পপত্রে শোভিত হয়ে উৎসবের রূপ নেয়। সুমধুর বাদ্যধ্বনি, সঙ্গীতের মূর্ছনায় প্রথপ্রান্তের রাজার প্রাসাদ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

বসন্তের লীলাচাপল্যে ভ্রূভঙ্গিমা দেখা দেয় মালোয়া নাগরীদের চোখে। পুরাঙ্গনা, কুমারী কন্যার দল প্রসাধিত সৌন্দর্যের আগুন জ্বালিয়ে মেতে ওঠে বসন্ত উৎসবে।

নৃত্যগীতে নরনারীর অবাধ মিলনের স্বাধীনতা এই একটি দিনের তরে। এই একটি উৎসব যেন সব বিধিনিষেধ, সব সামাজিকতার লজ্জা দূর করে তরুণ তরুণীদের মিলন ঘটায়। এই উৎসবের দিনেই হয়তো মিলনের প্রথম সোপান গাঁথা হয় কারো জীবনে, কেউ বা হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যথার স্মৃতি নিয়ে যায় মনের গোপনে।

রাজ-পুষ্পোদ্যানে উৎসবের উচ্ছ্বাস, আলো-ঝলমল নিকুঞ্জের বৃক্ষছায়ায় সম্ভ্রান্ত তরুণ তরুণীদের গুঞ্জরন।

এরই মাঝে একাকী ঘুরে বেড়ায় বিদেশী হেলিওডোরাস। সঙ্গী নেই, সাথী নেই, ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে শুধু মালোয়া রাজকুমারকে। তক্ষশীলায় শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করছে তার বন্ধু।

কিন্তু রাজকুমারী কোথায়?

তরুণীদের ভিড়ে বারংবার যেন একটি পরিচিত মুখ খুঁজে বেড়ায় হেলিওডোরাস।

মালোয়া রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা প্রেমিকের বাহুলগ্ন হয়ে বীথিপথে বিচরণ করতে করতে হঠাৎ দেখতে পায় হেলিও-ডোরাসকে।

সুদীর্ঘ সুপুরুষ বীরের মত সুদর্শন এই বিদেশীকে দেখে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে তাদের। ছলনায় প্রেমের বাহু থেকে মুক্তি নিয়ে গোপনে এসে সাক্ষাৎ করে গ্রীক যুবকের সঙ্গে। চোখের ভাষায় প্রণয় প্রার্থনা জানায়।

কিন্তু হেলিওডোরাসের মনে শুধু একটি সুরের গুঞ্জরন। সে সুর রাজকুমারীর কণ্ঠে বাঁধা।

ব্যর্থ বিফল আক্রোশে সুন্দরীর দল একে একে বিদায় নেয়, কৌতূহলের চোখে লুকিয়ে জানতে চায় কে এই দিব্যপুরুষের প্রণয়-ভাগ্যবতী।

হেলিওডোরাসের কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বীথিপথ ধরে কেবলই রাজকন্যাকে খুঁজে বেড়ায় হেলিওডোরাস।

তারপর কোলাহল, জনতা দূরে রেখে ধীরে ধীরে একটি প্রায়ান্ধকার তুলসীকুঞ্জের দিকে এগিয়ে যায় হেলিওডোরাস। দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে শান্তিতে বসে থাকতে চায় সবুজ ঘাসের শীতল আসনে।

কিন্তু তুলসীকুঞ্জের দিকে এগিয়ে যেতেই ক্ষীণ সুরের গান শুনতে পায় গ্রীক যুবক। গান নয়, যেন বিষণ্ণ বেদনায় রোদনভরা এক নারীকণ্ঠ!

দূর থেকে দেখতে পায় হেলিওডোরাস। আনন্দে নেচে ওঠে তার মন!

নির্জনে একাকিনী একটি দোলনায় বসে শান্ত কণ্ঠে গান গাইছে রাজকুমারী। চোখের ম্লান দৃষ্টিতে যেন কান্না চাপা আছে।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাজকুমারীর রূপসুধা পান করে হেলিওডোরাস। কবরী ঘিরে পুষ্পের মুকুট, গলায় কুসুমের মাল্য। মণিবন্ধে চামেলী চম্পার অপরূপ বন্ধন। কটীতে পুষ্পের চন্দ্রহার। আর দুটি সুন্দর চরণে রক্তিম অলক্ত রেখা।

ধীর পায়ে রাজকুমারীর পিছনে এসে দাঁড়ায় হেলিওডোরাস।

কবিতার ছন্দে বলে ওঠে, হায় যদি হতেম আমি পুষ্পবীথিকা, দেবীর চরণ স্পর্শ করে ধন্য হতেম আজ!

পুরুষকণ্ঠ শুনেই চমকে ফিরে তাকায় রাজকুমারী।

এসেছে! তার গোপন মনের প্রণয়পুরুষ এসেছে!

লজ্জায় অধোবদন হয়ে কাছে এসে দাঁড়ায় রাজকন্যা।

হেলিওডোরাস হাত বাড়িয়ে রাজকুমারীর চিবুক তুলে ধরে। দুটি লজ্জারুণ চোখ তুলে তাকায় রাজকন্যা, মৃদু হাসিতে প্রণয় স্বীকৃতি জানায়।

দুটি সবল বাহুর আলিঙ্গনে ধরা দেয় রাজকন্যা। আপন পুষ্পমাল্য পরিয়ে দেয় হেলিওডোরাসের গলায়।

গ্রীক যুবক প্রশ্ন করে, কি নাম তোমার রাজকন্যা?

শান্ত উত্তর আসে, মাধবিকা।

হেলিওডোরাস পুনরায় কবিতার ছন্দে বলে, হায়, যদি হতেম আমি পুষ্পবীথিকা, দেবীর চরণ স্পর্শ করে ধন্য হতেম আজ! সুন্দরী হায় অনেক আছে, কুঞ্জে ফোটে একটি মাধবিকা, যাহার কাছে তুচ্ছ সবই, তুচ্ছ হবে তক্ষশীলারাজ।

মাধবিকা বলে, না ভদ্র, এই সামান্যা নারীর প্রেমই তুচ্ছ রাজ ও রাজৈশ্বর্যের কাছে। আজ মদনোৎসবের মত্ততায় যাকে আলিঙ্গনের সম্মান দিলে বিদেশী বন্ধু, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো তাকেই ভুলে যাবে তুমি।

হেলিওডোরাস বললে, তোমার চরণে শপথ রেখে গেলাম রূপময়ী, তোমার প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে কোনো দুরূহ কার্যেই পশ্চাৎপদ হবো না।

মাধবিকা আশ্বাস দিলো, আমিও আজ বসন্তলগ্নে শপথ নিচ্ছি, আজ থেকে আমি তোমার বাগদত্তা, কোনো বাধানিষেধ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না আমাদের মধ্যে।

বিদায় নিয়ে চলে গেল মাধবিকা, বিদায় নিয়ে গেল হেলি-ওডোরাস।

কিন্তু ঈর্ষাকাতর সুন্দরী যে-সব ললনারা গ্রীক যুবকের রূপে আকৃষ্ট হয়ে উপযাচিকার মতো এসে দাঁড়িয়েছিল হেলিওডোরাসের

কাছে, প্রত্যাখানে যাদের রূপকে অপমান করেছে ডিওনপুত্র, তারা লুকিয়ে দেখলো রাজকন্যার প্রণয়। মালোয়ারাজের কাছে সে খবর পৌঁছে দিলো তারা।

বৈষ্ণব মালোয়ারাজ উষ্মায় অন্ধ হলেন। একি বিধর্মীর আচার তাঁর পরিবারে।

কন্যাকে প্রশ্ন করলেন, সত্য বলো মাধবিকা, গ্রীকদূতের সঙ্গে কোন গোপন শপথ করেছো তুমি?

মাধবিকা নতশিরে স্বীকার করলো অভিযোগ।

মালোয়ারাজ বললেন, কিন্তু এ বিবাহ হতে পারে না মাধবিকা, বাসুদেবের পূজারী মালোয়ারাজের কন্যার পাণিগ্রহণ করতে পারে না যবন গ্রীকদূত।

রাজপ্রাসাদ থেকে হেলিওডোরাসকে বিতাড়িত করলেন মালোয়ারাজ। বললেন, দূত অবধ্য, তাই তোমার প্রাণ সংহার করলাম না গ্রীকদূত, কিন্তু এই প্রাসাদে আর কোনদিন যেন তোমার পদক্ষেপ না ঘটে।

—কেন সম্রাট? প্রশ্ন করলো হেলিওডোরাস।

মালোয়ারাজ বললেন, মাধবিকার বিবাহ একমাত্র বৈষ্ণব বংশেই হতে পারে বিদেশী, বাসুদেবের উপাসকের হাতেই কন্যা সম্প্রদান করবো আমি।

হেলিওডোরাস বললে, আমি কি যবন ধর্ম ত্যাগ করে বাসুদেবের ধর্ম গ্রহণ করতে পারি না সম্রাট?

সম্রাট উত্তর দিলেন, দ্বাদশ বর্ষ ধরে বাসুদেবের সাধনা করলে তবেই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করতে সমর্থ হবে তুমি।

—দ্বাদশ বর্ষ?

গোপনে দাসীর হাতে প্রেমলিপি দিয়ে মাধবিকার কাছে বিদায় জানালো হেলিওডোরাস। দ্বাদশ বর্ষ। মাধবিকা, সারা জীবন ধরে,

জন্ম-জন্মান্তর ধরে বাসুদেবের সাধনা করতেও রাজি আছি তোমার প্রেমের সম্মান রক্ষা করার জন্যে।

দূতের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে বাসুদেবের মন্দিরপ্রান্তে সাধনায় মন নিয়োগ করলো হেলিওডোরাস। রাজার বিচারে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে বৈষ্ণবরূপে।

এমনি বছরের পর বছর কেটে চলে।

মাধবিকার প্রতিজ্ঞা, বাগদত্তা সে, দ্বিতীয় বিবাহ তার হতে পারে না। ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হলো মাধবিকা। রূপ ম্লান হলো তার।

এদিকে সাধনায় রত গ্রীক যুবকের হিন্দুধর্মপ্রীতি, হিন্দু দেবদেবীর প্রতি নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হলো মালোয়ার প্রজাবর্গ।

রাজার কাছে অনুরোধ জানালো তারা, এই গ্রীক যুবকের সঙ্গেই রাজকন্যার বিবাহ দিন সম্রাট।

কন্যার প্রতি স্নেহবশত সম্মত হলেন মালোয়ারাজ।

কিন্তু হেলিওডোরাস তার দ্বাদশ বর্ষের সাধনা সমাপ্ত না করে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করবে না।

বছরের পর বছর কেটে চলে।

দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হবে আজ। সারা মালোয়ারাজ্য উৎসবের আনন্দে মুখরিত। বিবাহের মণ্ডপে গীতবাদ্যের অবিশ্রাম ধ্বনি। সুন্দরী ললনাদের ভিড়। পুষ্পে লতায় সমস্ত প্রাসাদ সুসজ্জিত, দীপালোকে আলোকিত সমগ্র নগর।

রাজপ্রাসাদের শঙ্খধ্বনি আর কোলাহলের মধ্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে গবাক্ষে অলিন্দে অপেক্ষা করে পরিবারের সকলে, পুরাঙ্গনারা ভিড় করে দাঁড়ায় পথের দু-পাশে।

কিন্তু একি! বরবেশে নয়। ত্যাগের গেরুয়া ভূষণে বিভূষিত হেলিওডোরাস হেঁটে চলে বিবাহমণ্ডপের দিকে।

বিস্ময় গোপন করেন মালোয়ারাজ। জামাতাকে আহ্বান জানিয়ে কন্যা সম্প্রদান করেন। মাধবিকা চোখ তুলে তাকায় হেলিওডোরাসের দিকে, পুষ্পমাল্য পরিয়ে দেয় গ্রীক যুবকের কণ্ঠে। হেলিওডোরাস পরিবর্তে তার কণ্ঠের ভক্তমাল্য পরিয়ে দেয় মাধবিকার গলায় ?

বলে, চলো মাধবিকা, এ ঐশ্বর্য এ বিলাসের মধ্যে আর ডুবে থাকতে চাই না। চলো মাধবিকা, প্রেমের চেয়েও বড়ো আকর্ষণ দেখতে পেয়েছি, তোমাকে দেখাতে চাই সেই পথ।

—কি পথ স্বামী ? প্রশ্ন করে মাধবিকা, কি আকর্ষণ ?

হেলিওডোরাস বলে, ভক্তি, মাধবিকা। প্রেমের চেয়েও উচ্চ আনন্দ এই ভক্তি। বাসুদেবের চরণে আশ্রয় নেবে চলো।

মাধবিকা সায় দেয় তার কথায়।

বলে, চলো, তোমার পথই আমার পথ, তোমাকে যিনি আশ্রয় দিয়েছেন আমার আশ্রয়ও তিনি।

ধীরে ধীরে বাসুদেবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলো এক যবন রাজদূত। আর এক মালোয়া রাজকন্যা।

দু-হাজার বছর আগেকার সেই বাসুদেবের মন্দির আজ নেই, কিন্তু ভীলসা শহরের পাথরের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। দেখতে পাওয়া যায় বেতোয়া নদীর অপর পারে উদয়গিরির গুহাসৌন্দর্য।

আর স্থানীয় গাইড এই অপরূপ উপাখ্যান বর্ণনা করে সুদীর্ঘ স্তম্ভটির দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বলে, এ হ্যায় খাম্বাবা !